ভাঁটফুলা মুক্ত

সংখ্যা ০৫ | ফাল্গুন ১৪২৮ | ফেব্রুয়ারি ২০২২

ই-সাময়িকী, সংখ্যা ০৫,
ফাল্গুন ১৪২৮, ফেব্রুয়ারি ২০২২
www.bhatphulsutra.com

ভাঁটফুলসূত্র কারিগর টিম
মনিরা রহমান মিঠি, হিরন্ময় চন্দ, রুখসানা কাজল
রফিক জিবরান, সাদাত সায়েম।

: ভাঁটফুলসূত্র

ভাঁটফুল
ভাঁটফুলকর্তৃক উপশহর, রাজশাহী, বাংলাদেশ
থেকে প্রকাশিত। ই-মেইল: bhatphul.pub@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.bhatphul.com

কারিগরদের কথা

প্রকাশিত ভাব মাত্রই অনুবাদ, ভাষা বাহন মাত্র। প্রতিটি সাংকেতিক বাহনের স্থানীয় পটভূমি, কল্পনার স্বাতন্ত্র্য এবং সাংস্কৃতিক ভিন্নতা রয়েছে। অবশ্য, প্রতিটি ব্যক্তিমনেরও রয়েছে নিজস্ব চিহ্ন, ভাষা এবং অনন্য অভিজ্ঞতা। ভাষার দুনিয়াটা তাই এক এবং বহু। দ্বৈতের মাঝে অদ্বৈত।

প্রাকৃতজনের মুখের ভাষা থেকে বর্তমানের বাংলা হয়ে ওঠার ঐতিহাসিক যাত্রাপথে দুনিয়ার অসংখ্য ভাষাবন্দর থেকে ভাব, রস ও বোধকে গ্রহণ করেছে। এককালের অবহেলিত বাংলা হয়ে উঠেছে নীচুতলার, অত্যাচারিতের ভাব প্রকাশের মাধ্যম। লড়াইটা তাই জন্মগত। আবার, নিকট প্রতিবেশী এবং দূর পৃথিবীর রস আস্বাদন করেই গড়ে উঠেছে বাংলাভাষার শক্তিশালী অনুবাদসাহিত্যের ধারা।

আমরা অনুবাদ করি, কেননা প্রকাশের আকাঙ্খা সৃষ্টিশীল সত্বাকে জীবিত রাখে। অনুবাদ করি, কেননা সৃষ্টি করি। আমরা নমিত পৃথিবীর সকল ভাষার সৌন্দর্য ও সরলতার কাছে।

সূচি

সাক্ষাৎকার

সুবিমল মিশ্র, শহীদুল জহির, মনোরঞ্জন ব্যাপারী'র সাহিত্যকর্মের অনুবাদক ভেঙ্কটেশর রামাশ্বামী'র সাথে আলাপচারিতা

পৃষ্ঠা ৭

ভাষান্তরিত কবিতা

আন্না আখমাতোভা, মারিনা সভেতায়েভার এবং অরহান ভেলির কবিতা

মুল রুশ থেকে ভাষান্তর: আলোময় বিশ্বাস

পৃষ্ঠা ২৩

গেরট্রুড কোলমারের ৪টি কবিতা

মূল জার্মান থেকে ভাষান্তর: নন্দিনী সেনগুপ্ত

পৃষ্ঠা ২৬

বিলি কলিন্স এর ৫টি কবিতা

ভাষান্তর: বদরুজ্জামান আলমগীর

পৃষ্ঠা ৩৫

নওশাদ নূরী, আহমেদ ইলিয়াস এর কবিতা

মূল উর্দু থেকে ভাষান্তর: হাইকেল হাশমী

পৃষ্ঠা ৪৪

আনোয়ার ঘানির কবিতা

বাংলা ভাষান্তর: গৌরাঙ্গ হালদার

পৃষ্ঠা ৪৮

মার্গারেট অ্যাটউড এর কবিতা

ভাষান্তর: নিশাত শারমিন শান্তা

পৃষ্ঠা ৫২

কুনবর নারায়ণ এবং অশোক বাজপেয়ির কবিতা

মূল হিন্দি থেকে ভাষান্তর: অজিত দাশ

পৃষ্ঠা ৫৭

নীলিম কুমার এর কবিতা

মূল অসমিয়া থেকে ভাষান্তর: বাসুদেব দাস
পৃষ্ঠা ৭০

ভাষান্তরিত প্যারাবল
সোরেন কিয়ের্কেগার্ড এর ১০টি প্যারাবল
ভাষান্তর: রফিক জিবরান
পৃষ্ঠা ৭৫

প্রবন্ধ
কবিতার অনুবাদ: প্রসঙ্গত কিছু কথা
স্বপন নাগ
পৃষ্ঠা ৮৩

বাংলা সাহিত্যে অনুবাদ ও প্রাসঙ্গিক বিষয়াবলী
মাজহার জীবন
পৃষ্ঠা ৯৫

অনূদিত গল্প
ভার্জিলিও পিনেরার পাঁচটি গল্প
বাংলা ভাষান্তর: নাহার তৃণা
পৃষ্ঠা ১১৭

ইসমত চুগতাই এর গল্প
বিষ
অনুবাদ: সফিকুন্নবী সামাদী
পৃষ্ঠা ১২৪

নগুগি ওয়াথিয়াঙ্গো এর গল্প
বৈভবের মুহূর্ত
অনুবাদ: দিলশাদ চৌধুরী
পৃষ্ঠা ১৩৪

সোনিয়া হোপ এর গল্প
দ্যা কেট
অনুবাদ: লুনা রাহনুমা
পৃষ্ঠা ১৪৭

জোহরা সাইয়েদ এর গল্প
সাকিনার চুড়ি
অনুবাদ: রুখসানা কাজল
পৃষ্ঠা ১৫২

পাঠপ্রতিক্রিয়া
গল্প, নীতিশিক্ষা ও ভাঁটফুলসূত্র
মোস্তফা জামান
পৃষ্ঠা ১৬০

শিল্প নির্দেশনা ও অঙ্গসজ্জা
হিরন্ময় চন্দ

সাক্ষাৎকার

সুবিমল মিশ্র, শহীদুল জহির, মনোরঞ্জন ব্যাপারী'র সাহিত্যকর্মের অনুবাদক ভেঙ্কটেশর রামাশ্বামী'র সাথে আলাপচারিতা

বিশিষ্ট অনুবাদক ও লেখক ভেঙ্কটেশ্বর রামাস্বামী কলকাতা নিবাসী একজন ভারতীয় তামিল। পিতামাতার সাথে বাল্যকাল থেকে কলকাতায় বসবাস। বাংলার ইতিহাস, ভাষা, বাংলাসাহিত্য সম্পর্কে তাঁর রয়েছে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা। সাহিত্যপত্রিকা লেখালেখির উঠান এবং ভাঁটফুলসূত্র এর পক্ষে মাজহার জীবন এবং রফিক জিবরান তার সাথে অনলাইনে ৪ অক্টোবর ২০২১ যুক্ত হয়েছিলেন অনুবাদ এবং প্রাসঙ্গিক বিষয়ে আলাপচারিতায়। আলাপচারিতাটি এখানে উপস্থাপন করা হলো।

লেখালেখির উঠান ও ভাঁটফুলসূত্র এর পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানাই। শুরুতে জানতে ইচ্ছা করছে একজন তামিল ভাষাভাষী হয়েও কোন ধরনের বিবেচনা থেকে বাংলা সাহিত্যকর্ম অনুবাদে আগ্রহী হলেন। আপনার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কেও জানতে চাই।

অনুবাদ কী করে আর কেন শুরু করলাম সেই সূত্রটাকে ধরে একটু পিছিয়ে যাই। আমি অনুবাদ আরম্ভ করলাম ২০০৫ সালে। আমার বয়স তখন ৪৫। পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স অবধি কী করছিলাম সংক্ষিপ্তভাবে তা বলছি। আমার পড়াশুনা ক্যাডেট কলেজে। ভারতের দেরাদুনে রয়্যাল ইন্ডিয়ান মিলিটারি কলেজ। আমার পড়াশুনা সেই স্কুলে। আমি মিলিটারিতে গেলাম না, আমার বন্ধুরা বাকি সবাই মিলিটারিতে গেল। তারপর কলকাতা ফিরে এসে ইকোনোমিক্স পড়ি, আন্ডারগ্রাজুয়েট এবং মাস্টার্স। এরপর আমি ইংল্যান্ডে চলে যাই চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সিতে কোয়ালিফাই করার জন্য। সেখানে পৌঁছে আমার মনে হলো চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সি আমার জন্যে মোটেই উপযুক্ত না। আর এটাকে আমি কোনো মতেই ধরে রাখতে পারবো না। জাস্ট কোনোভাবে চেষ্টা করে তিন চার বছর সেই কোয়ালিফিকেশনটা অর্জন করে তারপর যা করার তা করবো, ততটুকুও পারলাম না। তত ধৈর্য ছিল না আমার। তো সেটা ছেড়ে আমার দেশে ফিরে এলাম। তবে দু'বছর ছিলাম ওখানে। সে সময়ে নিজেকে শিক্ষিত বানানোর জন্য চেষ্টা করলাম ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে গিয়ে।

বৃটিশ লাইব্রেরিতে পৌঁছে আমি বুঝতে পারলাম আমি কত অশিক্ষিত। কার্ল

মার্কসও ওখান থেকে বই নিয়ে পড়াশুনা করতেন। ইংল্যান্ডের মতো উন্নত, ধনী দেশে কলকাতার মধ্যবিত্ত পরিবারের একটা ছেলে হিসেবে কালচারাল শক ভীষণভাবে অনুভব করলাম। যে কালচারাল শকের তলায় ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতি সব আছে। ঐ কালচারাল শক থেকে যে ইমপ্যাক্ট আমার ওপরে হলো সে জায়গা থেকে নিজেকে বুঝানোর চেষ্টা করলাম, কেন বৃটেন ধনী আর ভারতবর্ষ গরীব। ঠিক কেন এই প্রশ্নটা থেকেই শুরু। খুব স্পষ্ট করে বিষয়টা যেন বুঝতে পারা যায়। এভাবে আরম্ভ হলো।

২২ বছর বয়সে গেলাম ইংল্যান্ডে। দু'বছর পর ফিরলাম। যে লোকটা ফিরল আর যে লোকটা গিয়েছিল সে আর একই লোক নয়। একটা পরিবর্তন ঘটল আমার ভিতরে। অনেকেই বিদেশে যায় পড়াশোনা ইত্যাদি উপলক্ষে। সবার মধ্যে বিরাট পরিবর্তন ঘটে না। আমার মধ্যে ঘটল। বড় বড় ডিসিশান নিলাম সেই অবস্থায়। আর আমার বাকী জীবন সেই ডিসিশানের ভিত্তিতেই এগিয়েছে। আর আমার কোনো রিগ্রেট নেই এ ব্যাপারে। তো দেশে ফিরলাম... দেশের যে পভার্টি, যে গরীবী আছে তা লজ্জার ব্যাপার। সেটা একটা অভিশাপ। কার্স, অর শেম অব পোভার্টি। হাউ টু ইরাডিকেট দিস কার্স অর শেম অব পোভার্টি সেটাই ছিল আমার এ্যাম্বিশান। অনেকের এ্যাম্বিশান থাকে এতটা বাড়ি, গাড়ি... তো আমারও অ্যাম্বিশান ছিল কিন্তু তা মনিটারি টার্মে নয়। আমার অ্যাম্বিশান পোভার্টি ইরাডিকেশন কীভাবে করা যায়, বিশেষত শিক্ষার দিক থেকে। সেই সব উদ্দেশ্য মাথায় নিয়ে ফিরে এলাম দেশে।

একটা কলেজে লেকচারের চাকরি পেলাম। কলেজে দায়িত্ব ছিল সকাল ৬টা থেকে ৯টা চল্লিশ। তারপর সারাদিন ফ্রি। তো সারাদিন বিভিন্ন কাজে নিজেকে নিয়োজিত করলাম। সেই সময় কলকাতার ঝুপড়িবাসীদের নিয়ে একটা সংগঠন গড়ে উঠছিল, ছিন্নমূল শ্রমজীবী জিজ্ঞাসা। ঝুপড়িবাসীদের উচ্ছেদ চালাচ্ছিল পশ্চিমবঙ্গ সরকার তখন। উচ্ছেদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, ঝুপড়িবাসীদের সুস্থ পুনর্বাসন করা আর তাদের জন্য একটা আবাসন নীতি যাতে সরকার ঘোষণা করে যেটার মধ্যে এ ধরনের মানুষদের স্থান ও স্বীকৃতি আছে। এমন উদ্দেশ্যে একটা আন্দোলনের সাথে নিজেকে যুক্ত করলাম। তো এই এ্যাক্টিভিস্ট জীবন চলল প্রায় কুড়ি বছর। এই কুড়ি বছর অনেক চেষ্টা অনেক পরিশ্রম হলো কিন্তু কোনো জিনিস অর্জন হলো না। দেখানোর মতো বা বলার মতো কোনো জিনিসই অর্জন হলো না।

এমন একটা সরকারের সাথে ডিল করছিলাম যেটা একদম ইন্ডিফারেন্ট। তার কোনো ইন্টারেস্ট নেই এসব ব্যাপারে। দেয়ালে মাথা ঠেকানোর অবস্থা। সেই সময় পরিবারে কিছু ব্যাপার ঘটল। আমার বাবার একটা ব্যবসা ছিল। বাবার মৃত্যুর পর তার পার্টনার সেটা চালাচ্ছিল। তারপর সেই পার্টনার মারা গেলেন

আর উনার কোনো সন্তান নাই। সেই ব্যবসাটা সম্পূর্ণ আমার মায়ের কাঁধে চলে এলো। আমার মা'র ব্যবসা করার কোনো ইন্টারেস্ট ছিল না। তিনি স্কুল প্রিন্সিপাল ছিলেন। তো আমি খুব রিলাক্টান্টলি সেই ব্যবসা পরিচালনা করার দায়িত্বটা নিজের ঘাড়ে নিলাম। আমার অ্যাক্টিভিস্ট জীবনের একটা পয়েন্ট আউট অবস্থায় ছিলাম তখন। ও রকম সময় ফ্যামিলি বিজনেস এর

দায়িত্বটা চলে এলো। সেটা নিয়েই কাজ করতে শুরু করলাম আর তারপরে অনুবাদটা ধরলাম।

অনুবাদটা আরম্ভ হলো বাইচান্স বা বাই এক্সিডেন্ট। আমার একটা বন্ধুর সাথে দেখা করতে গেছিলাম। তো, তাকে জিজ্ঞাসা করলাম কী পড়ছেন আজকাল আপনি? ও বলল, দূর বাংলা আজকাল আর পড়ি না। পড়ার মতো নয় কিছু। আমি বললাম সেটা কী করে হয়, নিশ্চয় পড়ার মতো অনেক কিছুই আছে। একটু ভেবে বললেন হ্যাঁ আছে, উনার নাম সুবিমল মিশ্র। তো, সেটাই প্রথম সুবিমল মিশ্রের নাম শোনা। আমি ওই কথার সূত্রে বলে ফেললাম ঠিক আছে আমি অনুবাদ করবো। সুবিমল মিশ্রের নাম শুনিনি তার আগে, তিনি কী করেন, কী তার লেখার বৈশিষ্ট্য- কোনো কিছুই আমি জানতাম না। তারপর ঐ বন্ধুর কাছে অনুবাদ করবো বলার পর সে বলল, ঠিক আছে, তুমি যেহেতু বললে সুবিমল মিশ্র অনুবাদ করবে। তাহলে করতেই হবে। বন্ধুর ঠ্যালায় আমি লেখকের সাথে কন্টাক্ট করে উনার বইগুলো সংগ্রহ করি। তারপর বইগুলো আমার টেবিলে দু'মাস পড়ে ছিল। হঠাৎ একদিন অস্থির ফিল করছিলাম। কিছু করার ছিল না। খুব বোর লাগছিল। তো হঠাৎ সেই বইগুলো তুলে পড়তে শুরু করলাম আর সঙ্গে সঙ্গে অনুবাদও করা শুরু করলাম। সেটা ছিল ২০০৫ সাল। তো ঐভাবে আমার অনুবাদ-যাত্রা আরম্ভ।

তো, প্রথমধাপে সুবিমল মিশ্রের প্রথম পর্যায়ের ১৫টা গল্প অনুবাদ করলাম। ২০১০-এ বের হলো একটা বই হার্পারকলিন্স এর মাধ্যমে। তারপর আমি ঠিক করলাম যে, এটা নিয়ে আরও এগুবো, আরও সিরিয়াস হবো। প্রথম বইটা ঘটনাচক্রে বের হলো। দ্বিতীয় বইটা আরও সিরিয়াসলি অনুবাদ করা উচিত, মানুষের সুবিমল মিশ্রের লেখা পড়া উচিত... তার লেখক জীবনের শুরু থেকে শেষ লেখা অবধি কয়েকটা বই সিলেক্ট করে কয়েকটা বই বার করবো এটা ঠিক করলাম। ২০১০-১১তে দ্বিতীয় ধাপ আরম্ভ হলো আরও সিরিয়াস অনুবাদ করার।

এভাবেই কি শহীদুল জহির অনুবাদের ভাবনা আসে?

হ্যাঁ । জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা বেরুবে। হার্পার কলিন্স ওটা সম্ভবত ২০২২ এর জানুয়ারিতে বের করবে। হার্পার কলিন্স এর বইতে দুটো ছোট উপন্যাস

আছে। জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা এবং আবু ইব্রাহিমে মৃত্যু। জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা তো খুব ছোট। ইংরেজীতে কুড়ি বাইশ হাজারের শব্দ, বাংলাতে আরও কম। ওটা দিয়ে তো বইয়ের স্পাইন হয় না, হার্পার কলিন্স এর বইয়ের যা ফর্ম্যাট। ওরা বলল আরও মাংস দরকার। আগে প্রস্তাব দিলাম, জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা আর কিছু গল্প থাকতে পারে। ওটা ম্যাচ হচ্ছিল না। তো, জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা এবং আবু ইব্রাহিমের মৃত্যু প্রস্তাব করলাম আবু ইব্রাহিমের মৃত্যু পড়া ছিল না। প্রস্তাব করার পর তবে পড়লাম। পছন্দ হলো আমার। দুটোর মধ্যে একটা কন্ট্রাস্ট আছে। জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা ভীষণ পাওয়ারফুল। পুরোটা একটা প্যারাগ্রাফে লেখা। তার মানে লেখক ও তার চরিত্র, আব্দুল মজিদ, তার ভিতরকার যে রাগ ইত্যাদি একটা প্যারাগ্রাফে প্রকাশিত হচ্ছে। আবু ইব্রাাহিমের মৃত্যু আরও কোয়ায়েট, চুপচাপ। দ্ইু ভাই যদি থাকে স্পোর্টসম্যান, একটা যদি হয় লাজুক, বই পড়ে ইত্যাদি। তো এ দুই ভাইয়ের পাসোনালিটি ভিন্ন। দ্ইু ভায়ের মতোই উপন্যাসের ক্যারেক্টারটা ভিন্ন। কিন্ত একই লেখক লিখেছে সেটা স্পষ্ট। লেখকের সিগনেচার, নেচার- সেগুলো উপস্থিত। আর উনার যে রাজনৈতিক প্রশ্নগুলো দেখা- সেটাও উপস্থিত।

দাদা, ডুমুর গল্পটা পড়েছেন?

হ্যাঁ পড়েছি। দ্বিতীয় যে বইটা হার্পারকলিন্স বের করবে সেটা হবে ১০টা গল্পের সঙ্কলন। তৃতীয়টা হবে মুখের দিকে দেখি। কিছু লোক সেই রাতে পূর্ণিমা খুব পছন্দ করে। আমার, মুখের দিকে দেখি খুব পছন্দের। মনে হলো ইংরেজিতে মুখের দিকে দেখি-টাই জোরদার ইমপ্যাক্ট ফেলবে। এটা ম্যাজিক রিয়ালিস্টের আরও কাছে।

সুবিমল মিশ্রের পরে মনোরঞ্জন ব্যাপারীর বই এবং তালাশনামা কেন অনুবাদে আগ্রহী হলেন। শহীদুল জহির সম্পর্কে আরও জানার ছিল।

সুবিমল মিশ্রের গল্প অনুবাদটা যখন শেষের দিকে পৌঁছুলাম, তখন এরপর কী করবো ভাবতে শুরু করলাম। তো, সুবিমল মিশ্রের গল্প পড়া শুরু করলাম আরও করবো বলে। আর, তার ছোটগল্প নিয়ে কাজ করবো ঠিক করলাম। কারণ উনার লম্বা উপন্যাসগুলো মনে হলো অনুবাদের জন্য আরও কঠিন। আর হয়তো অনুবাদ সম্ভব না। কারণ, ওটা এতো এমবেডেড বাংলা ভাষা, বাংলা সংস্কৃতি, বাংলা রাজনীতি যে, অনুবাদ করলে হাজারো নোট, ফুটনোট দিতে হবে, সেটা ঠিক সাহিত্য নয়। অনেকে হয়তো করতে পারে। তো, সুবিমল মিশ্রের নাম আমি হয়তো কিছুটা প্রচার করতে পারলাম ছোটগল্প অনুবাদে। কিন্তু এটার মানে হলো যে, আরও অনুবাদ করতে থাকবো। সুবিমল নিয়ে থামবো না।

এটার পেছনে একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা আমার জীবনে ... আট বছর আগে আমার তেইশ বছরের বড় ছেলে মারা গেল। তো, ন্যাচারালি আমার খুব কষ্ট, ডিপ্রেসন। একদিন একটা মিটিংয়ে ছিলাম। ডিপ্রেসন খুব জোরে ধাক্কা দিল, মিটিং ছেড়ে দ্রুত বাড়ি ফিরে টেবিলে বসে যে অনুবাদ কাজটা করছিলাম, সেটা করতে শুরু করলাম। তখন থেকে অনুবাদ ব্যাপারটা আমার ক্ষেত্রে অন্য ব্যাপার হয়ে উঠল। এখন ডিপার লেভেলে অনুবাদ বিষয়টা কাজ করছে। অনুবাদ তো সহজে হয় না। সেটা ছিল ২০১৫ সাল। অনুবাদ করে যেতে হবে এরকম ব্যাপার হয়ে গেল মনের ভেতরে। তাই অনুবাদ করতেই থাকবো এরকম সিদ্ধান্ত নিলাম। এমন ভাবার সময় ফেসবুকে পড়লাম মনোরঞ্জন ব্যাপারী সম্বন্ধে আর কৌতুহল হলো বা ইন্টারেস্ট জাগল উনার ব্যাপারে। উনার জীবনের যে কাহিনী, গরীব বাড়ির ছেলে। স্কুলে যাননি বা লেখাপড়া শেখেননি আর অল্প বয়সে বাড়ি থেকে পালিয়ে চলে গেলেন, আর সারাজীবন একটা পরিশ্রম, অত্যাচার নিয়ে উনার জীবন। আর নিজেকে তৈরি করলেন, আর সেটা ঘটল জেলে যাওয়ার পর। পড়তে লিখতে শিখলেন। সাইকেল রিকশা চালক হিসেবে কাজ করলেন আর তখন থেকে লেখার শুরু।

তো সুবিমল মিশ্রের অনুবাদ করার পর থেকে ভাবলাম অনুবাদ যদি করি তবে ভয়েসেস ফ্রম দি মার্জিন বা প্রান্তিক স্বর, সেটাই করবো। সেটা ঠিক করেছিলাম। মনোরঞ্জনের কাহিনী তো একেবারে প্রান্তিক মানুষের কাহিনী। উনাকে কন্টাক্ট করলাম। উনি বললেন যে, উনার আত্মজীবনী কেউ একজন অনুবাদ করছে অলরেডি। আর তারপর চ-ালজীবন নামের যে উপন্যাস উনি লিখেছেন একটা পত্রিকায়, চার খণ্ডে সেই উপন্যাস আমাকে দিলেন। আর সেটা হয়ে গেল ইংরেজিতে তিন খণ্ডে ট্রিলজি, চণ্ডালজীবন ট্রিলজি । ২০১৬ সালে সেটা নিয়ে কাজ আরম্ভ করি আর ২০১৮ এসে শেষ হয়। আর তারপর দু'বছর সেটা ঝুলে ছিল। আমাজন মনোরঞ্জন ব্যাপারীর সাথে সরাসরি যোগাযোগ করে উনার লেখার রাইটস নিয়ে নেয়। পাবলিশারের কাছে সেটা একটা প্রবলেম হয়ে দাঁড়াল। দু'বছর লাগল সেটা কাটাতে। তারাই জানাল যে, তারা বইটা বের করবে। প্রথমটা বেরিয়ে গেছে ২০২০ ডিসেম্বর মাসে। দ্বিতীয়টা বলল আরও চারপাঁচ মাস লাগবে। তৃতীয়টা আমি এখনো অনুবাদ করতে শুরু করিনি। সেটাও আগামী একদুবছরে বের হবে।

কিন্তু, ২০১৫-১৬তে মনোরঞ্জন ব্যাপারীর ব্যাপারটা ঘটল। আমারও ম্যাচুরিটি, জ্ঞান বেড়েছে। বাংলা সাহিত্য, প্রান্তিক সাহিত্য সম্পর্কে ধারণা জ্ঞান বেড়েছে। তালাশনামা, অনুবাদের সিদ্ধান্ত নেয়ার ব্যাপারটি ঘটেছে আমার বন্ধু সৌমিত্র দস্তিদারের কারণে। আর তাই এটির কৃতিত্ব সম্পূর্ণটাই ওর। ও আমার পুরনো বন্ধু। প্রায় পনের-ষোল বছরের। আমরা দুজনই একটা গবেষণা কেন্দ্রের সাথে যুক্ত। ও এখন যুক্ত না, আগে ছিল। সেটা ক্যালকাটা রিসার্স গ্রুপ। রণবীর

সমাদ্দার নামে একজন বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী গঠন করেছেন পঁচিশ বছর আগে। উনার চেষ্টা ছিল যে এটা একটা সিভিল সোসাইটির রিসার্স ইন্সিটিটিউট হবে। সরকারী না, বা শুধু বুদ্ধিজীবীমহলের রিসার্স ইন্সিটিটিউট না। সিভিল সোসাইটির, যারা অ্যাক্টিভিস্ট, যারা গবেষক, যারা লেখক, সাংবাদিক, উকিল, ইত্যাদি। সব সময় তিনি একাডেমিক সার্কেলের বাইরে, যারা কোনো না কোনোভাবে রাজনীতি বা সমাজ নিয়ে ভাবছেন বা কাজ করছেন তাদেরকে একত্রিত করার চেষ্টা এ রিসার্চ গ্রুপের। সৌমিত্র আর আমাকেও উনি জড়ো করেছিলেন সেই সংস্থার ছাতায়। সেইভাবে সৌমিত্রের সাথে পরিচয়। ফেসবুকে আমার একজন বন্ধু পোস্ট করল যে, সৌমিত্র দস্তিদারের একটা লেখা বেরিয়েছে পত্রিকায় বিভিন্ন লেখকের লেখা নিয়ে। তো সেই লেখায় দুটো বাক্য ছিল তালাশনামা আর ইসমাঈল দরবেশ এর ওপরে।

ঠিক যেভাবে আমার বন্ধু মৃণাল আমাকে বলেছিল সুবিমল মিশ্র নিয়ে, ঠিক তেমনি ইসমাঈল দরবেশের তালাশনামা নিয়ে সৌমিত্রের অভিমতকে গুরুত্ব দিয়ে গ্রহণ করলাম। কারণ উনার সঙ্গে অনেক দিনের পরিচয়। উনি একটা জিনিস যখন বলেন, নিশ্চয় ভেবেচিন্তেই বলেন। সঙ্গে সঙ্গে বইটা আমি সংগ্রহ করলাম। পাবলিশার কে তা জানার পর তার সাথেও যোগাযোগ করলাম। পাবলিশারকে চিনি অনেক দিন থেকে। ফোন করলাম, উনার কাছ থেকে ইসমাঈলের ফোন নাম্বার নিলাম। কথা বললাম। তারপর আমার হার্পারকলিন্স এর কলিগদের সাথে কন্টাক্ট করলাম। তারা বলল একটা নোট লিখতে আর একটা স্যাম্পল পাঠাতে। সেটাও করলাম। তাদের ভেতরের সভায় সেটা পেশ করা হয় আর সেটা অনুমোদন করা হয়। ওরা আমাকে জানিয়েছে ওরা বইটা প্রকাশ করবে। যখন আমি ইসমাঈল দরবেশের তালাশনামা'র নাম শুনি আর হার্পারকলিন্স জানায় যে, তারা ওটা করবে- এটা ঘটে দশ সপ্তাহের কম সময়ের মধ্যে। খুবই খুশি হলাম যে এতো তাড়াতাড়ি এটা ঘটল।

অনুবাদ করি স্বাধীনভাবে, কখনো ভাবিনি যে এটা কোন পাবলিশারের হয়ে করছি। আমি ঠিক করি, কী করবো, কী করা উচিত। কোনটার গুরুত্ব আছে। তারপর ঠিক করি যে, কোনো পাবলিশার আছে কী না খুঁজে দেখা। কোনো কোনো সময় রাজী হয় না। যেমন, সুবিমল মিশ্রের তৃতীয় বই যেটা হার্পারকলিন্স বের করেছে। ২০১৯ এ বেরুলো, কিন্তু ২০১৪ তে জানিয়েছে যে, ওরা করবে। তারপর ২০১৬তে জানাল যে করবে না। ২০১৭ তে নতুন এডিটর এলো ওখানে। সে তখন ঠিক করল যে, ওটা করবে। আরও একটা বই অনুবাদ করলাম, স্বাতী ভৌমিক নামে একজন লেখক। ওটারই প্রকাশক পাইনি। আমারই অনুবাদের ভিত্তিতে ওটা ফরাসী ভাষায় অনুবাদ হবে আর ফরাসী দেশে বেরুবে। আর আমার বিশ্বাস ভাল চলবে উপন্যাসটা, বিশেষ করে মহিলাদের ভেতরে।

আপনি তো, ২০০৫ সাল থেকে শুরু করলেন। কিন্তু, সুবিমল মিশ্র বা শহীদুল জহিরের ঢাকাইয়া কুট্টি ভাষা... এগুলোকে জানার জন্য কী কোনো ট্রেনিং নিয়েছেন?

আমি কোনো ট্রেনিং নিইনি। কেউ যখন কথা বলে আমি সেটা বুঝি। সারাজীবন কলকাতায় বাস করে এখানকার সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি সংস্কৃতি সম্পর্কে ইনভলব থাকা, বা এগুলো সম্পর্কে ভাবা। সে জন্য মনে হলো যে, সেই যোগ্যতা আছে আমার বুঝতে পারার। অনুবাদ করাটা সেই বোঝার পর আরেকটা ধাপ পেরোনো। আমি বুঝছি আর সেটাকে অন্য এক ভাষাতে নিয়ে আসছি। আর ইংরেজি তো জানি, সেটা নিয়েই ২/৩ বছর বয়স থেকেই ইংরেজির গণ্ডিতে আমাকে ঠেলা হলো। ইংরেজি মিডিয়াম স্কুলে। আর ভারতে একটা শ্রেণি আছে যাদের ইংরেজিতে দখল আছে। শুধু ইংরেজি মিডিয়াম স্কুল আমিই নই, আমার মা বাবারাও ইংরেজি মিডিয়াম স্কুলে পড়েছে। আমার ঠাকুরদা ইংরেজি মিডিয়াম স্কুলে পড়েছে। চার্চের একটা স্কুলে। আমার মা'র মা বাবারাও শিক্ষিত, গ্রাজুয়েট। তো সেই ব্যাকগ্রাউন্ডটা ছিল। বাড়ি ভর্তি বই। বাড়িতে বই নিয়ে, সাহিত্য নিয়ে আলোচনা। তো, সেই ব্যাকগ্রাউন্ডে মানুষ হয়েছি বলে ইংরেজির ওপর দখল। স্কুলে পড়ার সময় বাংলা কম্পালসারি ছিল। তারপর পশ্চিমবঙ্গ থেকে চলে গেলাম উত্তর প্রদেশে। সেখানেই আমার স্কুল শিক্ষা কমপ্লিট হলো। ওখানে বাংলা পড়া নেই। আর ফিরে এসে কলেজেও কোনো কম্পালসারি বাংলা নেই। কিন্তু ফিরে এসে কলেজে ঢুকে তারপর ৮ বছর বিদেশে থেকে গরীব মানুষদের নিয়ে একটু আদর্শ নিয়ে কলকাতায় ফিরে আসা।

তখন থেকে বলতে পারেন, আমার লাইফ লার্নিং, বাংলা নিয়ে, বাংলা ভাষা নিয়ে শুরু হলো আমার যখন ২৪ বছর বয়স। আমার সহকর্মী সব বাঙালি। সব কাজের ভাষা বাংলা। আমরা মিছিল মিটিং করলে শ্লোগানগুলো বাংলায়। বক্তব্য বাংলায়। লিফলেট বাংলায়। তো, বাংলা জগতে বাস করতে শুরু করলাম পুরোপুরি। ওদিকে আমার বিয়ে বাঙালি মহিলার সঙ্গে হলো। সেভাবেই বাংলা, বাঙালি পরিবারের ভেতরে প্রবেশ। কিন্তু যেহেতু আমি অবাঙালি থিওরিটিক্যালি, তো সব সময় একটা আউটসাইডারের চোখ ও মন আমার মধ্যে একটিভ।

সেটা তো আরও পজিটিভ?

হ্যাঁ। শেখা। যে জিনিসটা একজন বাঙালি লক্ষ্য করবে না, অত গুরুত্ব দিবে না আমি সেটা করছি। পশ্চিমবঙ্গে থেকে জীবন কাটিয়ে বাংলাটা বুঝলাম। বাংলাটা বুঝতে শিখলাম। আর তারপর ভাবলাম অনুবাদ করতে পারবো। কিন্তু কয়েকদিন আগে আমার ছেলেকে বলছিলাম, এখন যদি ভাবি যে, সুবিমল মিশ্র অনুবাদ করবো। এখন ভাবলে মনে হয়, ফেনাইল দিয়ে আমার জিভ

পরিস্কার করা উচিত। তুমি কী ভেবেছ চান্দু! কিন্ত আমি স্বীকার করি, আমার শেখা উচিৎ বা নিজে থেকে শেখার চেষ্টা করা- সেই বিবেক বা বুদ্ধি আমার আছে বলতে পারেন।

বাংলাদেশের বা পশ্চিমবঙ্গের পরিপ্রেক্ষিতটাকে আপনি কীভাবে অনুবাদ করছেন, ধরা যাক, কালি বা দূর্গা পূজার কোনো একটা বিষয় যখন ভিন্নভাষীদের জন্য অনুবাদ করছেন, তখন এ ধরনের চ্যালেঞ্জ কীভাবে সমাধান করেন?

হ্যাঁ, এসব দিক তো আছেই, এরকম চ্যালেঞ্জ তো আছেই। আমি যখন অনুবাদ করি, তখন অনুমান করি যে, বাঙালি পাঠক, ইংরেজিতে পড়ছে। ফলে কালি, অকালবোধন, ইত্যাদি তো সে জানেই, এটা প্রথম অনুমান। দ্বিতীয় অনুমান হচ্ছে সে বাঙালি না, কিন্তু ইন্ডিয়ান। তো, তারও কিছু ধ্যানধারণা আছে কালি, দুর্গা, বা এ জাতীয় বিষয় নিয়ে। তৃতীয়টা হচ্ছে বিদেশী বা ভারতীয় যারা এখানকার কিছু জানে না। তো, বিদেশীদের জন্য যখন কিছু অনুবাদ করি, তখন তাদের উপযোগী করে উপস্থাপন করতে হয়। যেমন, সুবিমল মিশ্রের যে অনুবাদ আমেরিকানদের জন্য করেছি, তাতে কিছু ফুটনোট বা বাংলা শব্দের পাশেই ব্র্যাকেটে বা কমা দিয়ে তার ইংরেজি মানে, এইসব করতে হয়েছে।

কিন্তু যে চ্যালেঞ্জটার আমি মুখোমুখি হই, তা খুব মাইক্রোস্ক্রাপিক। আলটিমেটলি একটা গল্প বা উপন্যাস কী? একটা শব্দের পর আরেকটা শব্দ, একটা বাক্যের পর আরেকটা বাক্য। তো ঐ শব্দ বা বাক্যের স্তরে নামিয়ে আনি সমগ্র লেখাটা। একটা শব্দ যার ইংরেজি অর্থ আছে। কিছু শব্দ আছে যার ইংরেজি হয়নি বা মানেটা হয়তো আশানূরূপ নয়। এক্ষেত্রে কাছাকাছি বা অন্যলোককে বোঝাতে পারি এ ধরনের শব্দ নিতে হয়। হয়তো ঠিক একই অর্থ বা মিনিংয়ের নয়। তো, সেই শব্দগুলোর ব্যাপারেও আমার নীতি বা দর্শন বলতে পারেন যে, সবাইকে শিখতে হবে। আমরা তৃতীয় বিশ্বের নাগরিক, ঔপনিবেশিক নাগরিক। আমরা অনেক কিছু জানি, ইউরোপ বা আমেরিকা সম্বন্ধে। কিন্তু উল্টোটা হয় কী? আমেরিকার একটা ছেলে ইন্ডিয়া, চায়না বা বাংলাদেশ সম্বন্ধে কতটা জানে? উত্তরটা হচ্ছে জানে না। সেটাই তো একটা বৈষম্য। ওটা শুধু বৈষম্য না, ওটা রাজনীতি। কিন্তু পরিবর্তন ঘটছে। আমার ইচ্ছে হচ্ছে ওরাও শিখুক, ওরা জানুক। একটা বিখ্যাত বই অনুবাদ করবো ভেবেছি। তার নাম হচ্ছে ভারতে হিন্দু মুসলমানের যুক্ত সাধনা। সেই বইয়ের লেখক হচ্ছেন ক্ষিতিমোহন সেন। ১৯৪৯ সালে লেখা। তিনি হচ্ছেন অমর্ত্য সেনের দাদু। দু'বছর আগে অমর্ত্য সেনের একটা আলোচনার পুরো বিষয় ছিল এ বই আর তার দাদু। তখন ভাবলাম এ বইটা অনুবাদ করতে হয়। তো, আমার এক বন্ধু বইটার একটা ফটোকপি দিয়েছিল। সেটা পড়ে আমার খুব ভাল লাগলো। তো, সেই বইয়ের টাইটেলের সাধনা শব্দটা আমি অনুবাদ করবো না। সাধনাই লিখবো। এইবার

তুমি শেখো সাধনাটা কী। আমি তোমার দেশের সব শব্দ যদি জানতে পারি, তুমিও জানো। বিশ্বের শব্দকোষের মধ্যে সাধনা, এই ধরনের শব্দের অনুবাদ দরকার নাই।

এটা খুবই ভাল পয়েন্ট। রাজনৈতিকভাবেও খুব গুরুত্বপূর্ণ।

ধরুন ইংরেজিতে যে শব্দ, ধরা যাক পুডিং। এটার কোনো বাংলা দরকার আছে? অনেক দেশের সংস্কৃতিতে আছে মেইন কোর্সের পর, ধরুন মিষ্টিটা। তো, নানান ধরনের মিষ্টি আছে। পুডিং সে রকমই কিছু। পুডিং হচ্ছে এক ধরনের মিষ্টি। সন্দেশ বা চমচমের কোনো অনুবাদ হতে পারে? চমচম চমচমই।

একটা উদাহরণ দিতে চাই। জীবনানন্দ দাশের। হাজার বছর ধরে আমি হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে- একটা অসম্ভব সুন্দর, সাধারণ কিন্তু পোয়েটিক লাইন বা রবীন্দ্রনাথ যখন গীতাঞ্জলির অনুবাদ করেন সোং অফারিং। তো, আমার কাছে গীতাঞ্জলি যে রকম অনুরণন ফেলে মনের মধ্যে, সোং অফারিং-এ তা করে না। কিম্বা বিম্বিসার ধূসর জগতে।

বনলতা সেন, মনে হয় পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি অনূদিত কবিতা। একজন আছেন ক্লিনটন বি শিলি। তো একবার কলকাতায় এক লেকচারে উনি নিজের অনুবাদ এবং অন্যদের অনুবাদ শোনালেন। উনি বনলতা সেন এর উনার অনুবাদ এবং অন্যদের অনুবাদ নিয়ে একটা ব্যাখ্যা করলেন। এতো কাজ করেছেন, নিজেও ভাল বাংলা জানেন। কীভাবে ইংরেজিতে কবিতার অনুবাদ হতে পারে, সেটাই ছিল উনার উদ্দেশ্য। সম্পূর্ণ এদিক থেকে ওদিক যাওয়া, দুটি ভাষাই বোঝে, তার পক্ষে অন্য ভাষায় নিজ ভাষার অভিজ্ঞতা হবে? সম্ভব না। খুব সাধারণ যে সব বর্ণনা যেমন, গাছে চারটা বাঁদর থাকতো বা গাছে ফল ছিল- এগুলো অনুবাদে হয়তো চ্যালেঞ্জ নেই। কিন্তু সিরিয়াস সাহিত্য তো সমাজেই প্রোথিত।

শহীদুল জহিরের মতো অনুবাদের জন্য চ্যালেঞ্জিং লেখা বাছাই করলেন কেন?

শহীদুল জহির, টরোন্টো শহরে ইকবাল হাশমী বাংলা জার্নাল নামে একটি পত্রিকা বের করেন। তো উনার সঙ্গে আমার আরেক বন্ধুর মাধ্যমে যোগাযোগ হয়েছিল। সুবিমল মিশ্রের অনুবাদ বাংলা জার্নালে বেরুলো। মনোরঞ্জন ব্যাপারীর লেখাও পাঠিয়েছিলাম তার কাছে। তখন তিনি একটা ইমেল করলেন, সেখানে তিনি বললেন, রামা তোমার যে অনুবাদের চোখ, তোমার উচিত বাংলাদেশের একজন লেখক শহীদুল জহিরের গল্পগুলো পড়া। তিনি ঢাকার একজন বন্ধুর মাধ্যমে গল্পগুলো আমার কাছে পাঠাতে বললেন। সেটা আমি পেলাম। আমি রেখে দিলাম পড়লাম না। পরে দেখবো। তার এক মাস পরে, করাচি থেকে পাকিস্তানের এক বন্ধু। তারা একটা পত্রিকা বের করে, দি সিটি। তিনি আমাকে

বললেন যে, কনটেম্পরারি সাউথ এশিয়ান লিটারেচার নামে একটা সংখ্যা বের করবে। বলল, তুমি যদি কিছু অনুবাদ করো। আমি বললাম, তুমি যদি আমাকে পাঠাও কিছু তখন দেখবো। তো, খোঁজখবর নিয়ে কয়েকজন বাংলাদেশী লেখকের লেখা আমার কাছে পাঠালেন। যার মধ্যে ছিল শহীদুল জহির। ডলু নদীর হাওয়া সঙ্কলনটা আর সব লেখার সফ্ট কপি উনি পাঠালেন। তো, তখন আমার মনে হলো যে, হ্যাঁ, শহীদুল জহির হচ্ছেন সেই লেখক যার নাম ইকবাল হাশমী আমাকে বলেছিল। তো পড়তে শুরু করলাম।

আর পড়তে শুরু করেই আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। প্রথম গল্প যেটা পড়লাম সেটা ছিল কোথায় পাবো তারে। পড়েই আমি মুগ্ধ, বা লেখকের জালে আটকে গেলাম। আর এ ধরনের একটা পড়ার ব্যাকগ্রাউন্ড আছে। লম্বা বাক্য। অনেকের ক্ষেত্রে হয়তো শহীদুল জহির কোনো আবেদন নাও থাকতে পারে। তবে আমার ক্ষেত্রে আমি হিপটোনাইজড হয়ে গেলাম। সঙ্গে সঙ্গে দুটো গল্প অনুবাদ করে ফেললাম। তো, ভাবলাম শহীদুল জহিরকে আরও সিরিয়াসলি নেয়ার এবং আস্তে আস্তে একটা প্রকল্প হয়ে গেল। বাই চান্স শহীদুল জহিরের সকল লেখা হাতে পাওয়া এবং সেগুলো পড়তে পারা।

কিন্তু শহীদুল জহির হচ্ছেন প্রথম বাঙালি লেখক, যার লেখা আমি পড়লাম পড়ার আনন্দের জন্য। পড়ার আনন্দ আমি বাংলা থেকে ইংরেজিতে করার সময় পেয়েছি। কিন্তু সেই পড়াটা অনুবাদের জন্য। আনন্দের জন্য নয়। তো, শুধু শহীদুল জহিরের লেখা স্বাধীনভাবে, পড়ার আনন্দ পাবো ভেবে পড়লাম। প্রায় দু'সপ্তাহ ডুবে ছিলাম তার লেখার মধ্যে। তো, আবার ভুলটা করলাম। সুবিমল মিশ্র করতে পারবো সেই আস্পর্ধার মতো শহীদুল জহির করতে পারবো সেই অনুমানটা একটা আস্পর্ধাই ছিল। বলতেই হবে, কারণ তারপর তার অনুবাদ করতেই থাকলাম। এখন সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমি বলতে পারি যে, সেটা আস্পর্ধা ছিল নিশ্চয়ই। অত সহজ ব্যাপার না। কিন্তু যেহেতু আমি মুগ্ধ, আর যেহেতু আমি করতে একদম ইচ্ছুক, করবোই এরকম সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম। আর সেজন্য, জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা'র জন্য ঢাকার একজন ছাত্রী, সাহরোজা, ওকে আমি যুক্ত করলাম এ কাজে। সেটা অসাধারণ একটা ব্যাপার হলো। দু'জন করাটা একজনের করার চেয়ে ভাল। আর, অনুবাদে কোন ইগোর স্থান নেই। দু'জন কাজ করলে আউটপুটটা উন্নত হয় সেটাই হলো। আর, বাংলাশের উপন্যাস, বাংলাদেশের কারো কারো করাই ভাল, ও নিজে উপন্যাসটা পড়েছে, আমি বাংলাদেশের ব-ও জানি না। আর, নিজেও অনুবাদটা করতে আগ্রহী। জামিল আহমদ এর নাটক দেখতে গিয়ে সে বইটা অনুবাদ করার ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে পড়ে। আর, আমি যখন লেখকের পরিবারের কাছে থেকে অনুমতিটা পেলোম, আর সে খবর সাহরোজা পেয়ে গেল। তারপর ও যুক্ত হয়ে গেল অনুবাদের কাছে। নিজেকে পুরোপুরি

দিয়ে দিল অনুবাদের কাজে। তো, সাহরোজা পুরো দায়িত্বটা নিজে নিয়ে নিল নিজে থেকে, সারাক্ষণ নিজে থেকেই ভাবছে। আমাকে বলতে হচ্ছে না ওটাকে দেখ। ও নিজে থেকেই দেখেছে। যেন ওরই প্রকল্প এটাকে বলে ওনারশিপ। তো যৌথ অনুবাদ প্রচেষ্টা দারুণভাবে সফল হলো। আমি সে সেক্ষেত্রে খুব ভাগ্যবান।

আমি, আমরা চ্যালেঞ্জটাকে নিলাম। প্রতিটা শব্দ, বাক্যের খুঁটিনাটি দেখছি বারবার। তো, ওর উপস্থিতি খুব জরুরি ছিল। ও ওর বন্ধুবান্ধবকে নিয়ে মন্দার্প, তার আসল মানে কী, ইত্যাদি। তো, লেখক, কিছু ডায়লগ গুলিয়ে ফেলেছেন পুরান ঢাকার সাথে অন্যান্য স্থানীয় উচ্চারণের সাথে। জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা'য় ডায়লগ তো খুব কম, সব থার্ড পারসন রিপোর্টেড স্পিচে আছে। আর, কয়েকটা জায়গায় ডায়লগ। যেখানে যেখানে ডায়লগ সেসব স্থানে রোমান হরফে ডায়লগুলোকে রিপ্রোডিউস করি। তো, পুরান ঢাকার ডায়লগুলোর ক্ষেত্রে উনি কিছু মিসটেক করেছিলেন। সাহরোজা গবেষণা করে মিসটেকগুলোতে সংশোধন করেন। আমরা কারেক্ট রোমানটা দিলাম। কারণ অথার কিছু ভুল করেছেন। ওর সহযোগতিটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আর, এই কোলাবরেন থেকে আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে, এরপর থেকে পরবর্তী সময়ে সকল অনুবাদ সহ-অনুবাদক নিয়েই করবো।

দীর্ঘদিন ধরে অনুবাদ করার পরে। মুক্তিবাহিনী অব বেঙ্গল গ্রুপ করেছেন। লেখালেখির উঠান, ভাঁটফুলসুত্র এসবের সাথেও পরিচিত হচ্ছেন। আপনার পরিকল্পনা কি?

আমি চাই যে, অনেক অনুবাদ হোক। এখনো জীবিত অনেক ধরনের লেখক আছে। অনেক ধরনের লেখা আছে। শহীদুল জহির এর নামটাই বা কতজন জানতো। উনার মৃত্যুর পরে জানা হয়েছে। এখনো বড় বড় লেখকদের যে খ্যাতি বা পরিচিতি, সেটা এখানো ঘটেনি তার ক্ষেত্রে। আর সেটা হয়তো ভাল। সবকিছুকে বাজারে বা মেইনস্ট্রিমে আনা যায় না। কিছু কিছু জিনিসের ভিন্ন থাকাটাই ভাল। বাংলাদেশের যে লিটারেরি জিনিয়াস, যে সাহিত্য প্রতিভা আছে তা পৃথিবীর সাহিত্যপ্রেমীদের জানানো দরকার। কারণ তারাও জানুক বাংলাদেশে কী ধরনের সাহিত্যপ্রতিভা আছে। সাহিত্যের ইতিহাসে মহান উপন্যাস আছে যেমন ওয়ার এন্ড পিস, ডক্টর জিভাগো, কিম্বা পঁচিশ বছর বয়সী একজন তার্কিশ উপন্যাসিক ইয়াসির কামাল তাঁর উপন্যাস নেমেদ মই হক পড়েছিলাম। আর পড়ার সময় মনে হলো, কী অসাধারণ কাজ। তার্কি ইতিহাসের একটা পর্যায়, ফিউডাল সমাজ কীভাবে একটা আধুনিক সমাজ, ক্যাপিটালিস্ট সমাজে পরিবর্তন হলো বা হচ্ছে, উনার গল্পটা সেই ক্যানভাসে প্লেস করা হয়েছে। ওটা শুধু একটা গল্প বা উপন্যাস নয়। একটা জাতির ইতিহাস বা জাতির গল্প পৃথিবীর অন্য লোকেদের সাথে ভাগ করা হচ্ছে।

বাংলাদেশের যে লিটারেরি জিনিয়াস তা পৃথিবীর মানুষের জানা উচিত। সে জন্যই অনুবাদকদের মুক্তিবাহিনী। মুক্তিবাহিনী, কারণ তারাই তো বাংলাদেশকে মুক্তি দিল, তাদের স্যাক্রিফাইস ও সাহসের ফলে। তো, সেই স্পিরিট নিয়েই যারা কাজ করবে, তারাই তো একই স্পিরিট নিয়ে কাজ করবে, এগিয়ে নিয়ে যাবে। পশ্চিমবঙ্গে নানা ধরনের লেখক আছে, যেমন সুবিমল মিশ্র। আগে অনুবাদ হয়নি। আরও আছে অনুবাদ হয়নি। অনেক অনুবাদক দরকার। সাহরোজার সঙ্গে কাজ করার পর ঠিক করলাম অন্যদের সাথেও কাজ করবো। আর, এতে অন্যরাও কিছুটা অভিজ্ঞতা লাভ করবে। তারপর তারা নিজেরাই স্বাধীনভাবে অনুবাদ চালিয়ে যাবে। সেই উদ্দেশ্যেই মুক্তিবাহিনী অব ট্রান্সলেটর গড়ে তুললাম। অনুবাদ থেকে আমার অভিজ্ঞতা হলো যে, অনুবাদটাকে ক্যাজুয়ালি নিলে হবে না-ওটাকে সিরিয়াসলি নিতে হবে। সকলেরই নিজস্ব কাজ আছে। আর কখনো কখনো একটু সময় দিলাম, একটা গল্প অনুবাদ করে ফেললাম, সেটা ঠিক আছে, সেটাও ভাল। কিন্তু তারচেয়েও বেশি সময় দিতে হবে, রেগুলারলি, মাসে, প্রতি সপ্তাহে বা প্রতিদিনেও হয়তো এক ঘন্টা সময় দিলে, যেমন ভোরবেলা উঠে কেউ যদি একঘন্টা অনুবাদ করে, সেটা এক বছর পর লম্বা উপন্যাস হবে। তো অনুবাদটাকে সিরিয়াসলি নিতে হবে। যাতে সেই ধরনের একটা স্পিরিট বা ইচ্ছে জাগে সেটাই আমার উদ্দেশ্য।

আপনার অনুবাদ শুরু আর এখন যে অভিজ্ঞতা- এ দুটো বাস্তবতার ভেতরে আপনি কী ধরনের পার্থক্য উপলব্ধি করেন?

যে লোক ষোল বছর আগে ঠিক করল যে, সুবিমল মিশ্র অনুবাদ করবে আর এখন যে অভিজ্ঞতা- এ দুটো বাস্তবতার ভেতর অনেক ডেভেলপমেন্ট ঘটেছে। আগের চেয়ে অনেক গভীরতা চলে এসেছে আমার মধ্যে। আর বাংলা ভাষাকে আরও গভীরভাবে বুঝতে শিখেছি। ভাষা সম্বন্ধে ভাবার ব্যাপারটা শিখেছি। আর, কন্টিনিউয়্যাস লার্নিং এর অ্যাটিচ্যুড চলে এসেছে। আর, হ্যাঁ, যে কোনো একটা জিনিস শুরু আর শেষের মধ্যে তো পরিবর্তন আছেই। যখনই কেউ কোনো সাধনায় ব্রত হয়, একটা পরিবর্তন ঘটে তার নিজের ভেতরে। তো অনুবাদ একটা সাধনা।

সুবিমল মিশ্র যে ধরনের গদ্য সাহিত্যের জন্ম দিয়েছেন...। এটার পাশাপাশি ইংরেজি বাক্য গঠন, বাংলা বাক্যের যে গঠনপ্রণালী তা স্বাভাবিকভাবে আলাদা...

যে ভাষাতে অনুবাদ করছি, তার তো কিছু রুলস আছে। ঠিক যেভাবে বাংলা ভাষাতে লেখা হয়, আমার সেভাবে শেখা হয়নি, শুধু বুঝতে পারি। বাংলা গ্রামার আমি জানি না। তো, সেভাবে ইংরেজির গ্রামারও আমি জানি না। যা গ্রামার শিখেছি স্কুলে সব ভুলে গেছি। তো, গ্রামার সম্বন্ধে যদি কোনো প্রশ্ন করা হয়, আমি সেভাবে উত্তর দিতে পারবো না। কিন্তু ইংরেজি ভাষাটা মাথার

ভেতর, কানের ভেতর, চোখের ভেতর, মুখের ভেতর চলে এসেছে। কোনটা বলা যায়, কোনটা বলা যায় না, কোনটা সঠিক, কোনটা সঠিক না তা সেন্স করতে পারি। তো, ইংরেজি ভাষা সম্বন্ধে আমার একটা সেন্স আছে কোনটা গুড ইংলিশ, কোনটা বেটার তা সেন্স করতে পারি। সেটাকেই ব্যবহার করি। আর, এই শব্দের জায়গায় ঔ শব্দ বা যদি ব্যবহার করি যেটাতে একটা পোয়েটিক কোয়ালিটি আছে বা মজার কোনো ব্যাপার আছে তখন সেই সেন্স ব্যবহার করি। একটা এস্থেটিক সেন্স কাজ করে আর সঠিক ভাষাটা কী সেই সেন্স কাজ করে।

সুবিমল মিশ্র এমন ধরনের লেখক যিনি ভাষাকে নিয়ে কী করা যায় সেটা এক্সপেরিমেন্ট করছেন, ভাষাটাকে নিয়ে কত জায়গায় নিয়ে যাওয়া যায় সেটা এক্সপেরিমেন্ট করেছেন। তো, তাকে নিয়ে কাজ করে আমার মধ্যে একটা পরিবর্তন এসেছে যে, ইংরেজি ভাষার যে লিমিট্স আছে, সেটাকে কত স্ট্রেচড করা যায়, কতটা প্রসার ঘটানো যায় সেটা নিয়েও আমাকে ভাবতে হয়েছে। একটা বাক্য কীভাবে লেখা যায়, অলিখিতভাবে পাঠকের মনে, বাক্যের গঠন কীভাবে হওয়া উচিত- সেটাকে কত দূরে নিয়ে যাওয়া যায়। তো শহীদুল জহির সেটাকে নানাভাবে এক্সপেরিমেন্ট করেছেন। একটা লম্বা বাক্য, সেখানে হয়তো পনেরটা ব্যাপার আছে, একটা জিনিস দিয়ে শুরু হয়ে নানান কথা বলার পর সেখানে আবার ফিরছেন। তো, ইংরেজিতেও একইভাবে বাক্যের রূপটাকে অক্ষুন্ন রাখার চেষ্টা করি। তো ইংরেজি বাক্যের যে নিয়ম তাকে কতটা প্রসারিত করা যায় সেই চেষ্টাটা থাকে।

আর ওটা করতে একটা আনন্দ পাই। ওটা একটা মজার ব্যাপার আছে। শহীদুল জহির ইচ্ছে করেই লম্বা বাক্য লিখেছেন। ওটা করেই উনি আনন্দ পেয়েছেন। আমিও সেটা পড়ে আনন্দ পাই।

আমাদের একজন শিক্ষক, কবি অসীম কুমার দাস, তাঁর সাথে এক আলাপচারিতায় বলছিলেন যে, বাংলাতে কিছু শব্দ আছে ইংরেজি ভাষাতে অনুবাদ প্রায় অসম্ভব। যেমন আনন্দ। এ ধরনের শব্দ ইংরেজিতে অনুবাদের ক্ষেত্রে কী বিবেচনা করেন?

উনি ঠিকই বলেছেন। আনন্দ একটা স্পিরিচুয়ার শব্দ । শব্দটা সেক্যুলার নয়। ইংরেজি জয় (Joy) শব্দটা ঠিক আনন্দ নয়। তো, যে শব্দটা আনন্দের কাছাকাছি আসতে পারে সেটা হচ্ছে ব্লিস (Bliss)। সেটাও ঠিক আনন্দ নয়। একজন সাধক, একজন সুফি বা একজন ভক্ত যখন উনার সাধনার গভীরে আছেন, আর সেখানে থেকে উনার মুখে একটা হাসি চলে আসে, সেটা হচ্ছে আনন্দ। যিনি কিছু একটা বুঝে উঠেছেন, সব প্রশ্নের উত্তর তার মনে স্পষ্ট হয়ে গেছে, কোনো কিছু আর জানার বাকি নেই, যেন উনি উপরওয়ালার

কোলে বসে আছেন - সেটাই তার আনন্দ।

আপনি বাঙালি না আবার ইংলিশও না। এটা আপনাকে একটা বাড়তি সুবিধা দিচ্ছে কি-না?

আপনি বলার আগে কখনো ভাবিনি যে, আমি বাঙালি না। আবার ইংলিশ না। তো যে দু'টো ভাষা নিয়ে আছি আমি দু'টোই আমি পেয়েছি। আর, আমার নিজের যে ভাষা যেটা নিয়ে জন্মেছি, বলতে পারেন সেটা আমি ত্যাগ করেছি। তো, সবাই সবকিছু পারে না। কিছু করতে গেলে কিছু ত্যাগ করতে হয়। কয়েক বছর আগে আমার যে স্থান, দক্ষিণ ভারতে, তামিলনাড়– সেখানে গিয়েছিলাম। আর ভাবতে ভাবতে আমার মনে হলো যে, এ জায়গাতে আমি থাকিও যদি, ভাষাটা আমার কাছে সহজ হয়ে যাবে ঠিকই, কিন্তু যেভাবে আমার পশ্চিম বাংলার মানুষ, জীবন, ভাষা, ইতিহাস জানি, সেটা আমার এ জীবনে তামিল মানুষদের নিয়ে অর্জন করবো না এ জীবনে।

এখানে দাদা, আপনার সাথে যুক্ত করি। বাঙালি জাতির একজন অন্যতম চিন্তক বঙ্কিমচন্দ্র, উনি এক জায়গায় বলছেন, বাঙালি একটা বহু জাতির সমষ্টি। তো সেই অর্থে আপনিসহ অনেকেই আছেন দীর্ঘকাল ধরে বাংলাতে বসবাস করছেন, অনেক শত শত বছর ধরে। আবার, একটা জাতি তো অবিমিশ্রভাবে একই রক্তধারায় প্রবাহিত কোনো জনগোষ্ঠী না.... অনেক জনগোষ্ঠী মিলেই একটা জাতি হয়। তো, সেক্ষেত্রে আপনার কী মনে হয়, বাঙালি কী একটা বহুজাতিক জাতি হয়ে উঠছে?

আপনি যদি ভৌগলিকভাবে অবিভক্ত বাংলাকে দেখেন, একদিকে পুরুলিয়া থেকে কুমিল্লা, বরিশাল, চট্টগ্রাম। একটা প্রায় মহাদেশ। কোথাও পাহাড়, কোথাও জলাভূমি, কোথাও লাল মাটি- একটা বিরাট বৈচিত্র্য। ভারতে যেভাবে জিওগ্রাফিক্যাল ডাইভার্সিটি আছে, অবিভক্ত বাংলাদেশেও তাই আছে। তবু সেই ভাইভার্সিটির মধ্যে কিছু কমনালিটি আছে, গান আছে, সাহিত্য আছে। ইদানীং বাংলাদেশে যাতায়াতের পর থেকেই একটা আগ্রহ জন্মেছে অবিভক্ত বাংলাকে বোঝা। সাতচল্লিশের পর থেকে যে পরিবর্তনগুলো হয়েছে, যোগাযোগ কমে গিয়েছে বা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তো, এই দুই দেশ তার নিজের পথেই এগিয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে প্রায় চেনাই যায় না। একেবারে আলাদা, এত ভিন্ন! তো, বাংলাদেশে যাওয়া আমার জন্য খুবই একটা এক্সসাইটিং ব্যাপার ছিল। সব সময় লক্ষ্য করেছি ভিন্নতা বা সমানতা। চিন্তা করেছি এক সময় কীরকম ছিল বা ভবিষ্যতে কী রকম হতে পারে। বর্ডার তো সাময়িক।

একটি আঞ্চলিক ভাষায় লিখিত সাহিত্যকে যখন ইংরেজিতে অনুবাদ করেন, তখন কী ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করেন।

অনুবাদক হিসেবে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ডায়লেক্ট। তো, ডায়লেক্ট বলতে পছন্দ

করি না। বুলি বলতে পারি, সবই ভাষা। ওগুলো সবই জীবিত। লাখো মানুষ, কোটি কোটি মানুষ প্রতিদিন তা ব্যবহার করছে। সে ভাষা আছে জগতে, কাল্পনিক নয়। তো যখন ইংরেজিতে আনবো, তখন কে সেই ইংরেজ? ইউকে আছে, অস্ট্রেলিয়া আছে, ইউএস আছে। আবার, বাংলাতে যেমন নানান রকম ডায়ালেক্ট আছে, ইউকেতেও নানা রকম আঞ্চলিকতা আছে। কীভাবে চাঁটগাঁইয়া বা পুরান ঢাকার ভাষা, ইংরেজিতে অনুবাদ করবো- তার কোনো সমাধান আমি পাইনি স্টান্ডার্ড ইংরেজি এবং ডায়লেক্ট ব্যবহারের ক্ষেত্রে। তো উপায় বার করলাম অনুবাদের ক্ষেত্রে। যেখানে ডায়লেক্ট থাকে, সেখানে ইংরেজির পাশাপাশি রোমান হরফে ডায়লেক্টটা রাখা। তাহলে কিছুটা সেই ভাষার রসটা চলে আসবে অনুবাদে।

আমি নিজে থেকে একটা কারেক্ট সিনথেটিক ইংরেজি ক্রিয়েট করতে পারি অনুবাদের ক্ষেত্রে, সেটা স্টান্ডার্ড ইংলিশ থেকে একটু ভিন্ন। কিন্তু সেটা কৃত্রিম. জীবিত নয়, চাঁটগাঁইয়া বা পুরান ঢাকার মতো মুখের ভাষায় ব্যবহৃত নয়। আর আমার অনুবাদও আমার গঠন করা এক একটা সেমি ইংরেজি ভাষা, সেটা আমার তৈরি করা, ওটার কোনো বাস্তবতা নেই, তার কোনো অস্তিত্বই নেই। অনুবাদকের জন্য ডায়লেক্ট একটা বড় চ্যালেঞ্জ। একটা সমাধান হতে পারে ডায়ালেক্ট থেকে ডায়লেক্টে অনুবাদ করা। বাংলাতে যেমন ডায়লেক্ট আছে, ইংল্যান্ডেও তেমন ডায়লেক্ট, ইত্যাদি আছে। অনুবাদের পাশে রোমান হরফে মূল ভাষার বুলিটা রাখা। বা ইংলিশ স্টিকিং ওয়ার্ল্ড, ক্রিয়ল নামে যে ভাষা। আফ্রিকা, ফ্রেঞ্চ ভাষার মিশ্রণে যে ভাষাটা তৈরি হয়েছে।

কারিগরি অগ্রগতির বর্তমান পর্যায়ে অনুবাদের ভবিষ্যত কী?

অনেক দূর অবধি অনুবাদকের দরকার আছে। গুগল ট্যান্সলেশন এতো বাজে অনুবাদ করে, আমি ওটা কখনো ব্যবহার করি না। ওটা থেকে থেকে দূরে থাকি। সাহিত্য অনুবাদের ক্ষেত্রে, কবিতা বা গল্প, অনুবাদক ছাড়া হবেই না। নিশ্চয়ই ভবিষ্যতে হতে পারে যদি ডিপব্লু'র সাথে গ্যারি কাসপারভের দাবা খেলায় পরাজিত করা সম্ভব হয়। তো, অনুবাদে নিশ্চয় একদিন পারবে।

আমরা কীভাবে আমাদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে পারি?

প্যান্ডেমিকের সময়ে গুগল মিট, জুম, ইত্যাদির ব্যবহার বেড়েছে। এখন সহজেই নিজেদের ভেতর আদানপ্রদান বাড়ানো যায়। এপার বা ওপার থেকে কোনো একটা উদ্যোগ নিলে সেখানে কাউকে আমন্ত্রণ করা যায়। এখন এগুলো সহজ হয়ে এসেছে।

দারুণ একটা সময় কাটল। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

ভাষান্তরিত কবিতা

আন্না আখমাতোভার কবিতা

মূল রুশ থেকে ভাষান্তর: আলোময় বিশ্বাস

ক্রুশের প্রতিরূপ

আমাকে কবরে দেখে কেঁদোনা মা।

১
এই মহৎ সময় ছিলো বর্ণবলয় আর বজ্রপাতের
ঐকতান, যেনো দেবদূতের; আকাশ হতে গলে পড়ছিল আগুন।
সে তার পিতাকে বলল,' আমার প্রয়োজন কি ফুরিয়ে গেছে?'
আর মাকে বলল,'কেঁদোনা মা ...'

২
মাগদালিনা লড়েছে, কেঁদেছে আর অভিযোগ করেছে
পিটার ডুবে ছিল পাথরের গর্তে ...
শুধু সেখানে, যেখানটায় মা একা দাঁড়িয়ে ছিলো
সেখানে কারো নজর পড়েনি, এক পলকও নয়।

মারিনা সভেতায়েভার কবিতা

মূল রুশ থেকে ভাষান্তর: আলোময় বিশ্বাস

আনন্দ আর আনন্দ সংবাদ এই যে
দিনের আলোয় আমার স্বপ্নগুলি জেগে উঠছে
সবাই আমার শুয়ে থাকা শরীরে ঘুম দেখে
কেউ আমার স্বপ্নকে দেখতে পায় না

এসব থেকেই সারাটা দিন
স্বপ্ন খেলা করে আমার চোখের সামনে
রাত এখন আর আমার ঘুমের জন্য নয়
এই তো, আমার দোলায়িত ছায়া
পড়েছে, ঘুমিয়ে থাকা বন্ধুদের ওপর।

মধ্যরাত পেরিয়ে গেছে।
তবু কেন আলো জ্বলছে
পাহাড়ের পাশের বাড়িটিতে?
কী হচ্ছে সেখানে?
তারা কি গল্প করছে না কি
তাস খেলায় মগ্ন?
কোন একজন অথবা বাকীরাও ...

যদি আড্ডা দিচ্ছে তো কী নিয়ে?
যুদ্ধ কিংবা দেনা?

হয়তো কোনকিছুই ওদের আলাপের বিষয় নয়,
বাচ্চারা ঘুমাচ্ছে
বাড়ির কর্তা খবরের কাগজ পড়ছে
স্ত্রী হাত চালাচ্ছে সেলাই কলে।

হতে পারে এসব কিছুই ওরা করছে না।

কে জানে? হয়তো এমনকিছু করছে
যা ক্রমাগত কেটে ফেলছে কোন স্পন্সর-পর্ষদ।

অরহান ভেলির কবিতা

ভাষান্তরঃ আলোময় বিশ্বাস

আরেকটি ভ্রমণের গল্প

তোমাকে অভিবাদন, আশাহত আমার বেদনা!
গতকাল মরে গেছে, ধূসর চোখের রাজা।
শরতের সন্ধ্যা ছিলো রক্তবর্ণ আর গুমোট হাওয়ার সময়
যখন আমার স্বামী ঘরে ফিরে শান্তস্বরে বলেছিলোঃ
‘তোমাকে বলি, পুরানো এক ওক গাছের নীচে পাওয়া যায়
তার লাশ, মৃগয়ায় ছিলেন তিনি
সেখান থেকেই নিয়ে আসা হয়েছে।

রাণীর জন্য দুঃখ হয়, সে তো এখনও পূর্ণ যুবতী।
একটি রাতেই যেন ফ্যাঁকাসে হয়ে গেলেন তিনি’।

এই বলে, ফায়ারপ্লেসের পাশ থেকে পাইপটা নিয়ে
তিনি রাতের কাজের পথে পা রাখলেন।
এখন আমি আমার মেয়ের ঘুম ভাঙাতে চাই
আমি তার ধূসর চোখের ওপর আমার চোখ রাখবো
জানালার বাইরে বার্চবনে মর্মরধ্বনি, তারা নিরন্তর
বলে যায় ‘এই পৃথিবীতে তোমার রাজা বলে
আর কেউ নেই...’।

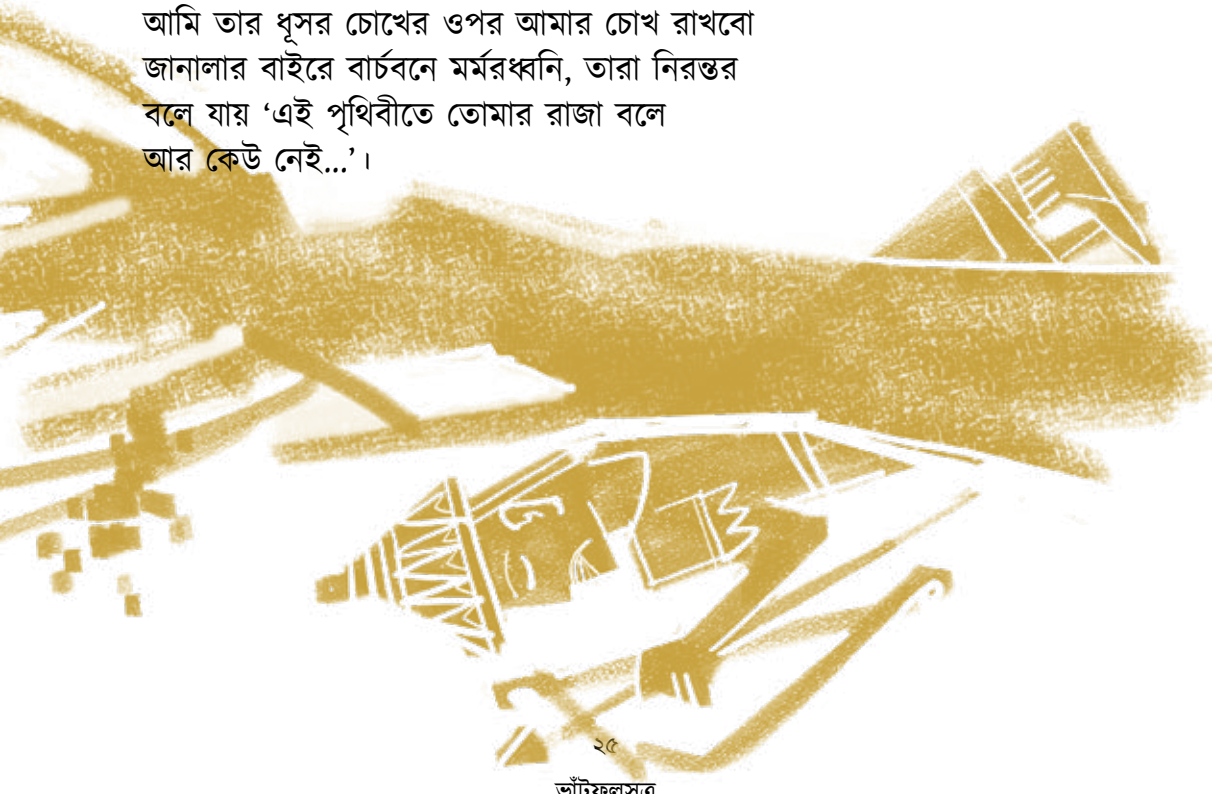

গেরট্রুড কোলমারের কবিতা

মূল জার্মান থেকে ভাষান্তরঃ নন্দিনী সেনগুপ্ত

হাজার স্বপ্ন

['টাউসেন্ড ট্রুমে' (Tausend Trume) অবলম্বনে লেখা]

হাজার স্বপ্ন আমার দুচোখে,
তুমি কি পাচ্ছো শুনতে?
দিন কেটে যায় তোমার জন্য-
হাজার স্বপ্ন বুনতে।
এক রাতে বুঝি নীড় ছেড়ে তুমি-
আকাশে মেলবে ডানা!
হাজার স্বপ্ন দেখতে আমার-
তবুও নেই তো মানা।

#

হাজার স্বপ্ন তোমার জন্য,
পারবে কি তুমি গুণতে?
তোমাকে ডাকবো শত শত নামে-
পাচ্ছো কি তুমি শুনতে?
প্রিয়তম ওগো, তুমি দেবদূত-
উড়ন্ত প্রজাপতি,
স্বর্ণখচিত ধূসর ডানায়
চঞ্চল দ্রুতগতি!

#

তোমাকে ডাকবো শত শত নামে-

তুমি কি শুনতে পাচ্ছো?

তোমার জন্য পঞ্চাশ খুশি,

তুমি কি শুনতে পাচ্ছো?

#

পঞ্চাশ খুশি তোমার জন্য,

ভরেছি সুখের ঘর।

তোমারি জন্য মুখে হাসি ফোটে,

কেঁপে কেঁপে ওঠে স্বর।

সোনালি সকালে পাহাড়ের পথে,

অরণ্যপথ ধরে-

রঙিন পোশাক তোমারি জন্য

সাজিয়েছি থরে থরে।

#

পঞ্চাশ খুশি তোমার জন্য,

তুমি কি শুনতে পাচ্ছো?

কিন্তু হৃদয় একটিই আছে,

শুধুই তোমার জন্য...

শুনতে পাচ্ছো?

তোমার জন্য, একটি হৃদয়-

আমরা ইহুদী

['ভিয়ার ইউদেন' (Wir Juden) অবলম্বনে লেখা]

শুধু রাত শুনছে,
ওগো আমাদের প্রাণের মানুষ, মনের মানুষ,
এসো আমরা সবাই ভালোবাসি।
এসো হাতে বেঁধে বেঁধে নিজেদের মুড়ে রাখি উত্তাপে।
সেই নারীটি যেভাবে পুরুষটিকে জড়িয়ে ধরেছিলো,
ফাঁসিকাঠের গর্তের মুখে দাঁড়ানো তার স্বামীকে,
একজন মা যেভাবে তার অপবাদগ্রস্ত ক্লিষ্ট সন্তানকে
একাকী ফেলে যেতে পারে না... এসো, ঠিক সেভাবে
জড়িয়ে মুড়িয়ে থাকি আমরা।

#

যদি তোমার কণ্ঠ থেকে উদ্গত চিৎকারের রক্তের নদীকে
কেউ রুদ্ধ করে দিতে চায়,
ডাক দাও সবাইকে,
চিৎকার করে ডাকো, অনন্তকালের গহ্বর থেকে ডাকো।
যদি তোমার কম্পিত দুটো হাত কেউ শৃঙ্খলে বেঁধে রাখে-
হয়ে ওঠো সেই হাত,
যা ঈশ্বরের স্বর্গের আসন টলিয়ে দিতে পারে।

#

গ্রিকরা পাহাড় কেটে তৈরি করেছিল শ্বেতশুভ্র ঈশ্বরের মূর্তি।
রোমানরা পৃথিবীকে ঘিরে তৈরি করেছিল এক অপ্রতিরোধ্য বর্ম!
মোঙ্গোলিয়ার সেনাদলের ক্ষমতা আর শক্তি
উঠে এসেছিল এশিয়ার গভীরতা থেকে।
আখেনের সম্রাটরা দৃষ্টিপাত করেছিল
দক্ষিণের বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের অপরূপ ছবিতে।
জার্মানি আর ফ্রান্স হাতে তুলে নিয়েছে বই আর খোলা তরোয়াল।
ব্রিটিশরা চলেছে সমুদ্রতরণীর নীলচে রূপালি পথ ধরে।
রাশিয়া অন্তরে জ্বেলেছে আলো, বিস্তার করেছে বিশাল ছায়া,
আর আমরা?
আমরা হেঁটে চলেছি ভ্রাম্যমান ফাঁসিকাঠের চাকার পাশে পাশে।
এই বেঁচে থাকা, এই ধুকপুকুনি, এই স্বেদ,
এই অশ্রুহীন শুকনো চোখের হা হুতাশ, বিলাপ
সবকিছু বাতাসকে গ্রাস করতে চায় এক অদ্ভুত বিপন্নতায়,
অসীম অনন্তের মধ্য থেকে উঠে আসে শাশ্বত দীর্ঘশ্বাস।
কুৎসিত বাঁকা নখের থাবার মধ্যে,
বজ্রমুষ্টি ফাঁদের মধ্যে, দড়ির ফাঁসের মধ্যে,
চিতার স্তূপের মধ্যে
তার শিরা সবুজ হয়ে ওঠে বিষধর সাপের মত,
সে গুমরে গুমরে ওঠে,
ছোবল দিতে চায় তার শ্বাসরোধকারী জল্লাদকে।
জড়বৃদ্ধ দাড়ি, নরকের আগুনে পুড়ে যাওয়া আত্মা,
শয়তানের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত কান আর অন্ধ চোখ পালাতে থাকে ...

#

সবাই শোনো, যখন খারাপ তিক্ত সময় আসে,

তখনই আমি উঠে দাঁড়াতে চাই,

হয়ে উঠতে চাই বিজয়তোরণের মত

যার মধ্য দিয়ে যন্ত্রণাগুলি আমি পিছনে ফেলে আসতে পারবো।

#

না, যে হাত রাজদণ্ডের আশীর্বাদে পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছে,

আমি চাইনা সেই হাতে চুম্বন করতে।

কঠিন সময়ের অন্ধগলির সামনে তার মাটিমাখা পায়ের কাছে

হাঁটু গেড়ে বসতেও চাইনা।

ওহ, আমি জ্বলে উঠতে চাই মশালের মত,

অন্ধকার শীতল মরুভূমিতে।

জানিনা কীভাবে জ্বলে উঠবো আমি!

জানিনা কীভাবে বলে উঠবো আমি?

‘ন্যায় চাই, ন্যায়বিচার! বিচার চাই!’

আমার গোড়ালি –

শৃঙ্খল টেনে টেনে চলছে আর মস্তিষ্ককে টেনে রাখছে পিছনে।

আমার ঠোঁটদুটো –

সেলাই করে গলিত মোমের শীলমোহর দিয়ে আটকানো আছে।

আমার আত্মা –

অজস্র আবেদন নিবেদনের গারদের খাঁচায় বন্দী হয়ে আছে।

আমি বুঝতে পারছি একটা হাত ধরেছে আমার চুলের মুঠি

আমার অশ্রুমাখা মুখ ঠেসে ধরা হচ্ছে ছাইয়ের গাদার স্তূপে।

#

শুধু রাত শুনছে।

আমার লোকেরা, আমার প্রাণের মানুষেরা,

আমি তোমাদের ভালোবাসি।

ভালোবাসি তোমাদের একঢালা আলখাল্লার মত পোশাকে দেখতে।

এই পৃথিবীর পৌত্তলিক উপাসনায় ভালোবাসি।

গ্রিক দেবী গাইয়ার পুত্র অবসন্ন হয়ে ফিরে গিয়েছিল মায়ের কাছেই,

তোমরাও নেমে যাও পাহাড়ের উতরাই ঢাল ধরে,

আরও নিচে।

আরও দুর্বল হয়ে যাও...

যতক্ষণ না তোমার অবসন্ন হাইকিং বুটজোড়া

ঐ শক্তিশালী মানুষদের ঘাড়ে গিয়ে পদাঘাত না করে।

রাতের রক্তগোলাপ

['ডি হ্রোজ ইন ড্যের নাখ্ট' (Die Rose in der Nacht) অবলম্বনে লেখা]

আলো ছড়াচ্ছে। কেশদাম ঢেউ তোলে,
লাল ভেলভেটে কালো সাপ খেলে যদি,
সৌরভতৃষা জাগিয়ে ক্লান্ত করো,
হে রমণী, তুমি... হৃদয়, শুধু এ হৃদি...

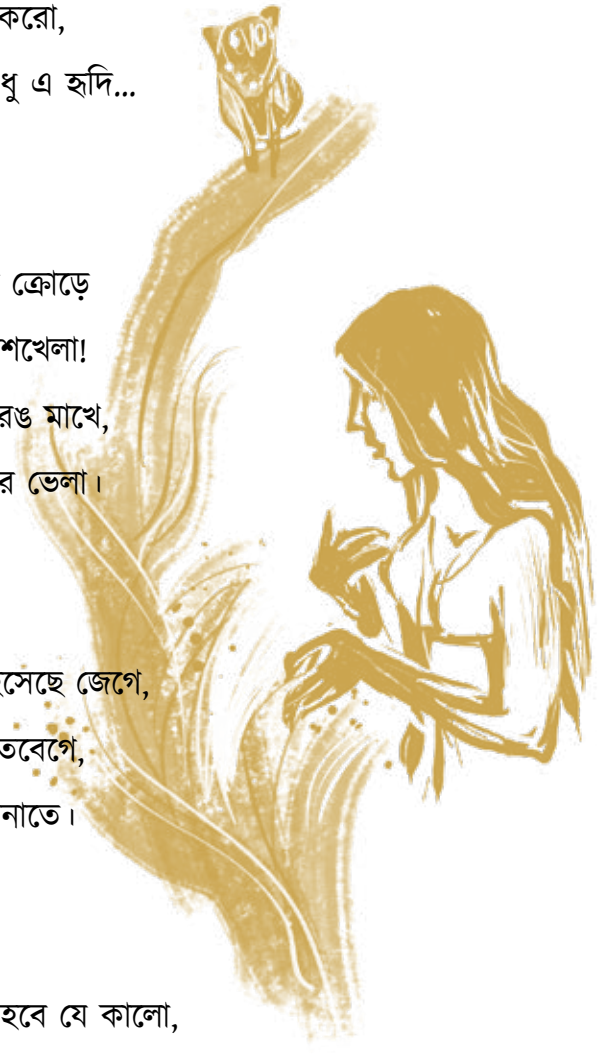

#

উষ্ণ হৃদয় ফুটেছে প্রেমের ক্রোড়ে
স্বর্গ ছোঁবে কি কোমল পরশখেলা!
সে হৃদয় আজ দুই গালে রঙ মাখে,
বাদামি সন্ধ্যা ভাসায় সাগরে ভেলা।

#

পেচকের প্রেত আঁধারে হেসেছে জেগে,
তন্দ্রা ছুটিয়ে উড়ে যায় দ্রুতবেগে,
মানুষের সব স্বপ্ন বেঁধে ডানাতে।

#

কাল ভোরে গাছে শুকিয়ে হবে যে কালো,
রাত্রে ছড়াবে গোলাপের মত আলো।
রক্তগোলাপ দাঁড়াবে আবার রাতে।

পোশাক

['দাস ক্লাইড' (Das Kleid) অবলম্বনে লেখা]

এটা আমার সারা সপ্তাহের কাজের পোশাক। দ্যাখো তোমরা।
ফুটোফাটা, দাগ ধরা, অজস্র তালি মারা পোশাক।
ময়লা তেলচিটে দাগের উপরে জমেছে ধুলো,
মাকড়সার জালের দাগ একেবারে এঁটে রয়েছে।
মরচে ধরা সেফটিপিন দিয়ে আড়াল করে রাখতে হবে
ছিঁড়ে ফেটে যাওয়া অংশটা।

#

কিন্তু যখন ছুটির দিন এবং আমার প্রিয় বন্ধু,
দুইই একসঙ্গে আসে, তখন
আমি আর এই পোশাকটা পরি না।
আমি আমার হৃদয় ঘিরে বেঁধে রাখি
এক সুন্দর পুষ্পস্তবক
আর খুশিমনে দেখা করতে যাই বঁধুর সাথে।

#

পোশাকের ছেঁড়া জমির উপরে
গজিয়ে ওঠে নরম সাদা ফার,
ছেঁড়াফাটা অংশগুলোর মধ্য দিয়ে ঠিকরে ওঠে
রূপোলি আলো।
মরচে ধরা সেফটিপিনগুলো ঢেকে যায় তারার মালাতে,

গাঢ় নোংরা দাগগুলো হয়ে যায় মুক্তোর ঝালর,

হাল্কা দাগগুলো হয়ে যায় হীরে বসানো ফুল

মাকড়সার জাল বদলে যায় সোনাজরি আর

সাদা সুতোয় বোনা নক্সাতে।

#

কিন্তু সবচেয়ে সুন্দর হল সেই ছোট পুষ্পস্তবক

যার রূপ দেখে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে

প্রিয় বন্ধুর গোলাপি মুখ

সেই স্তবক জন্মেছে আমার বক্ষ বিদীর্ণ করে।

#

আমার হৃদয়ের চারপাশে

ফুটে উঠেছে এক সুন্দর ছোট পুষ্পস্তবক।

কবি পরিচিতিঃ

গের্ট্রুড কোলমারের জন্ম মধ্যবিত্ত ইহুদী পরিবারে ১৮৯৪ সালে বার্লিনে । ১৯১৭ সালে প্রকাশিত হয় প্রথম কবিতার বই। ১৯২০ সালের পর থেকে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে তার কবিতা। সমালোচকরা বলেছিলেন যে গের্ট্রুড সম্ভবত ইহুদীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জার্মান ভাষার লেখিকা। ত্রিশের দশকের শেষ দিক থেকে যখন নাৎসিবাহিনীর অত্যাচার জোরদার হতে থাকে ইহুদীদের উপর, গের্ট্রুডের বহু কবিতার বই নষ্ট করে ফেলা হয়। নিজের বাসস্থান ছেড়ে বারবার স্থানান্তরিত হতে হয় নাৎসিবাহিনীর হাত থেকে বাঁচবার জন্য। ১৯৪৩ সালের মার্চ মাসের পরে তার আর কোন খোঁজ পাওয়া যায় না । কার্যকারণ, সূত্র সবই বলছে সম্ভবত, ঐ সময় তিনি আউসভিৎসে খুন হয়ে যান।

বিলি কলিন্স এর ৫টি কবিতা

ভাষান্তর : বদরুজ্জামান আলমগীর

বাতাস হালকা- কিন্তু তার আছে এক অফুরন্ত অদৃশ্য ভার : বিলি কলিন্স-এর কবিতা তেমনই নির্ভার, অথচ আছে এক জীবনদায়ী ভার। বাঙলায় আমরা হাসতে হাসতে দেয়াল ভাঙো দাদাঠাকুর- বলে যে একটা আপ্তবাক্য বলি, কলিন্সের কবিতা তেমনই এক আটপৌরে চালে বাঁধা। জীবনের, অভিজ্ঞানের, দূরদর্শিতার এমন একটি অনায়াস যৌগ ধারণ করেন কলিন্স- যার নিরিখে তাঁকে লেখার টেবিলে কোন জোরাজোরি করতে হয় না; পানির পিঠে পানির প্রবাহ দেখতে বড় মনোহর লাগে- কিন্তু তার অন্তর্লীনে যা কার্যকরভাবে জমাট বাঁধে তার নাম প্লাবন। কলিন্স তাঁর নিজের সম্পর্কে যেভাবে বয়ান করেন তা বড় মোক্ষম- মনে হয়, সবসময়ই একজন পাঠক আমার সঙ্গে এক কামরায় থাকে, তাকে পিঠে হাত দিয়ে যত্নশীল সৌজন্যে প্রত্যেকটি কবিতার প্রথম লাইন শুরু করি, তারপর চোখ বন্ধ করে উন্মাতাল ছুটতে থাকি- যাত্রাপথে বিবিধ আতঙ্ক, ভাঙচুর, ক্ষয়ক্ষতির মুখে পড়ি, আমি পাঠককে এই উত্তুঙ্গ সর্বনাশের মাঝখানে ফেলে পালিয়ে আসি- এভাবেই আমার কবিতাটি এক বিশ্বাসঘাতক মাধুরির উপর গঠিত হয়ে ওঠে। বিলি কলিন্স জন্মেছিলেন ১৯৪১ সনের ২২শে মার্চ নিউইয়র্কের ম্যানহাটনে।

মৃতজন

মৃতরা নিয়ত আমাদের পানে তাকিয়ে দেখে

জুতা পরার সময়, কী স্যান্ডুইচ বানাবার প্রাক্কালে

তারা বেহেশতের তটিনী 'পর বিহারি স্বচ্ছ তরণী

নেহারি আমাদের চলাচল, তারা নাও বায় ধীর লয়।

তাদের আকাশী দুনিয়ার নিচে দেখে আমাদের দল

চলে ফেরে মানুষের কোলাহল, হয়তো আমরা
বুঁদ হয়ে আছি বিকালের মধুক্ষরা গীতে
তারা ভাবে আমরা তাদের আনাগোনা তুলি আঁখিপাতে।

সাবধানে তারা হয় আমাদের বাজান ও জননী
মৃদু বৈঠায় আমরা যেন নিদ্রা যাই- ঘুমের মোহিনী।

The dead.

চন্দ্র কারিগর

ছোটবেলায় রাত্তিরে সে আমাকে ভয় দেখাতো
মুখটা কেমন আলগা করে উপরের দিকে তুলে ধরতো
এখন ভাবতেও পারি না- এতোটা নীরক্ত, গা ছমছমে।

আজ পাহাড়ের উঁচুনিচু টিলা বেয়ে বাড়ির দিকে
ড্রাইভ করছিলাম
তাকে দেখি গাছগাছালির পিছনে ক্রমে ডুবতে বসে
আবার আগের মতোই আমার দিকে মুখটি তুলে ধরে।

তার মুখ খোলা ময়দানে অবারিত হলে
মনে হলো অন্ধকার ব্রহ্মাণ্ডের সাথে
নিবিড় এক মিতালি গড়ে তুলেছে সে,

খাখা বুকের এক প্রসন্ন নৈঃশব্দ্যের নৃপতি যুবা
প্রাণের কথাটি আমূল রটিয়ে দেয়-
অন্তর চোবানো গানের ভিতর।

The man in the moon.

প্রকল্পহীন ভালোবাসা

আজ সকালে হ্রদের পাশ ঘেঁষে হাঁটতে হাঁটতে
আমি ছোট্ট গায়ক পাখি রনের প্রেমে পড়েছি
আর বিকেলের দিকে মনে ধরেছে একটি ইঁদুর
বিড়াল বাহাদুর ধপাসকরে পড়েছে খাবার
টেবিলের নিচে।

শারদ সন্ধ্যায় এক সেলাই দিদিমনির রূপে মজেছি
এখনও দর্জি বালিকার জানালায় সেঁটে আছি
এবার চোখ ফেরাই একবাটি তরল খাবারের দিকে
এ-তো ধোঁয়ায় হরিলুট, বুঝি নৌবাহিনীর যুদ্ধ জাহাজ।

আমার মন আওড়ায়- এমনটাই সেরা ভালোবাসা
কোন মুলামুলি নাই, রাগ গোস্বা দূর হও
লেনদেনের প্রশ্ন অবান্তর
একজন আরেকজনকে হরহামেশা সন্দেহ করছে না
ওরা ফোনের এপার ওপার কথাবিহীন ঠাণ্ডা নিরুত্তাপ।

সবকিছু ফুরফুরে গরম গরম অবসাদোত্তীর্ণ নির্ভার
মাথায় জ্যাজ টুপি শোভা পায়
একহাতে গাড়ির স্টিয়ারিং হুইল- কী দারুণ!

যৌনতার জিদাজিদি, ঠাস করে মুখের উপর
দরজা লাগানোর ব্যাপার রইলো না
ছোটমোটো একটা সরেস কমলার চারা, এই তো।
হাঙ্গামা হুজ্জতির কারবার লাপাত্তা
ধবধবে সাদা শার্ট, বিকেলে ঝরঝরে গোসল
ফ্লোরিডার ভিতর ছোটে নির্বিঘ্ন হাইওয়ে।
রেশারেশি, বাজাবাজি, রাগে চান্দি গরম করা
এসব কিছুই নাই
মাঝেমধ্যে কিঞ্চিৎ মান-অভিমান রইলো না হয়

একান্ত সাময়িক ব্যথা।

ছোট্ট পাখি রেন যে-কীনা তার বাসা বানিয়েছে
খুব নিচু একটি ডালে
ডালটি কেমন পানি ছুঁইছুঁই করে
ইঁদুরটি নির্বিবাদ মরে পড়ে আছে
মনে হচ্ছে, এখনও তার বাদামি কোটটিই পরা।

আমার হৃদয় আমি বসিয়ে রেখেছি বেদীর উপর
একটু বাদে যে তীরটি আসবে
তা যেন এফোঁড়ওফোঁড় ছিঁড়ে বেরুতে পারে।

লেজ ধরে মরা ইঁদুর জঙলার দিকে টেনে নেবার পর
নিজেকে গোসলখানার টাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি
আমাকে সাফসুতরো করে তুলবো বলে
সাবানের দিকে জুলজুলে চোখে কেমন তাকিয়ে আছি।
Poem : Aimless love.

নিরঞ্জন

প্রতিদিন কুকুরটি দরজা ঠেলে বেরিয়ে যায়
মাথায় আরাম টুপি নেই
হাতে রোদবৃষ্টির ঝাপটা থেকে বাঁচার ছাতা নেই
নেই কোন টাকাপয়সা পিছুটান কিচ্ছু না
না আছে ঘরে তালা লাগানোর বালাই
কিন্তু কী আশ্চর্য, আমার ঠিকই তার জন্য
মায়া লাগে, পিছুটান হয়।

মনে হয়, আমাদের চোখের সামনে
সে এক টাটকা নমুনা-
জীবনের প্রতিঘাটে মোড়ে মোড়ে এতোকিছুর দরকার কী-
ছোট্ট একটা ঢ্যাঁড়ায় একটা চামুচ একটা প্লেট
এই যেমন গান্ধী- সামান্য দানাপানি, একটা লাঠি আর ন্যাংটি।

কুকুরটি প্রতিদিন এই খাইখাই দুনিয়ার বাইরে চলে যায়
শইলের উপর একটা নেহায়েত জোব্বা
জামায় এই তো টেরি কাটা নীল কলার, ব্যস
গন্তব্য বলো নিশানা বলো- সবটা তার ভেজা ভেজা নাক
আর ওই যে টুসটুস করে শ্বাস ফেলে সেইটুক
পিছনে লেজখানি বুঝি পেখম- ওঠে নামে এটুকু তাড়িয়ে তাড়িয়ে দ্যাখে।

সারাদিনের কর্মসূচিতে সামান্য বিপত্তি ঘটে
যদি কোন বিড়াল এসে পথের মুখে পড়ে

এমতাবস্থায় তার বিড়ালকে গুঁতো দিয়ে পাশে সরাতে হয়
তা না হলে তার হাঁটাহাঁটি, সংসারিয়ানা, খাবারদাবার
এক্কেবারে নির্ঝঞ্ঝাট, অনায়াস
এভাবে সে হয়ে উঠতে পারতো চামে জীবন কাটানোর
বাছাই উদাহরণ-
তা আর হয়ে উঠলো না- কেননা বারবার এসে মাছি বসে-
তাই তার কান দুটি ঘন ঘন নাড়তে হয়,
আর আমিও আছি- তার জিম্মাদার।

Poem : Dharma.

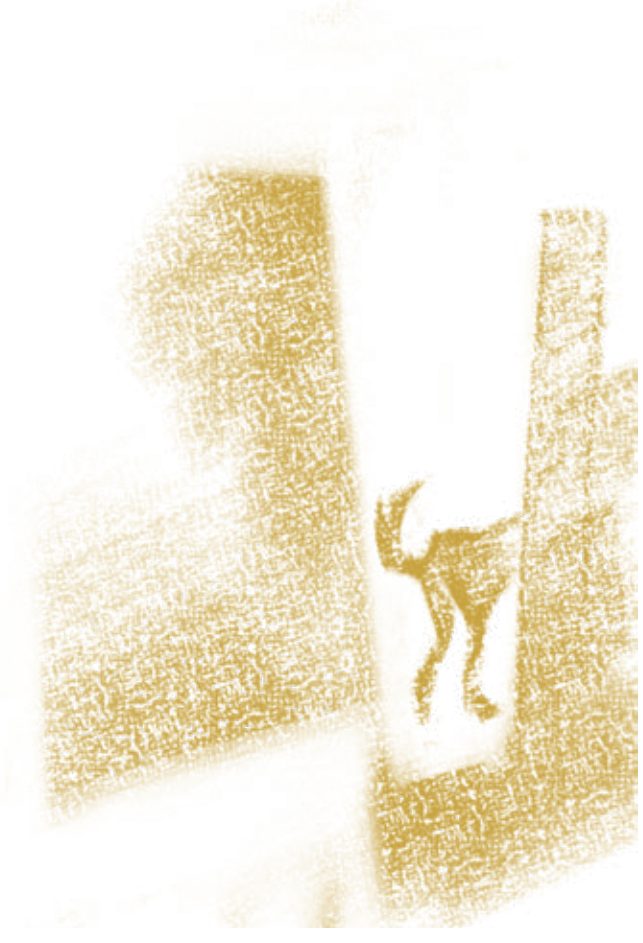

জাপান

আজ আমি জড়িয়ে আছি
একটি হাইকুর মীড়ে
কয়েকটি শব্দ বারবার আওড়াচ্ছি।

সতেজ মিঠা অনুভূতি এক
বারবার মুখে পুরছি
একই ছোট আঙুর ফল।

আমি বাড়ি জুড়ে হাঁটছি
মুখে ঝরে অক্ষরদানা
সব কামরা ভরে উঠছে আমার কথায়।

আমি পড়ছি পিয়ানোর নীরবতার কাছে
বাঙ্ময় সমুদ্রের ধারে
অপার নৈঃশব্দ্যের প্রাণে সুর ঝালিয়ে দিচ্ছি।

আমার অতলান্তের বুলি
কিছু না শুনেই বলছি বুদবুদ
বলছি না আর- এমনিই শুনছি।

কুকুর আমার দিকে মুখ করে
আমি হাঁটু গেড়ে বসি

তারপর ওর সাদা কানের কাছে বলি।
আমি একটি গির্জার ঘন্টার ধারেপাশে
তরজমা করছি নৈঃশব্দ্য
তার পিঠে একটি চুপচাপ মথ।

আমার মন বলে বেসামাল যন্ত্রণা হচ্ছে
বেচারি ঠাণ্ডা ঘন্টার
দিব্যি দাঁত কামড়ে বসে আছি মথ।

আমি জানালা বরাবর অনুক্ষণ বলি
বেলটা-ই দুনিয়া হয়ে যায়
তার উপরে মথ হয়ে জিরিয়ে নিই।

আয়নার কাছে বলছি মর্মর যখনই বা
আমি ভারী ঘন্টা
আর মথ সহজ পাখায় জীবন হয়ে যাচ্ছে।
পরিশেষে যখনই তোমাকে অন্ধকারে বলছি
তুমি হয়ে উঠছো ঘন্টা
আমি তোমাকে বাজাচ্ছি কথাদের উন্মীলন।

মথ উড়ে চলে গ্যাছে
বেলের উপর থেকে বাতাসে
আমি ঘন্টার না বলা কথা- বলে যাচ্ছি।
Poem : Japan.

নওশাদ নূরীর কবিতা

মূল উর্দু থেকে ভাষান্তর হাইকেল হাশমী

দখল – (সেনা শাসন)

এমন দৃশ্য দেখতে হয়, নেই যে কোন উপায়
এমন ঘৃণা, চোখ যে সেই দিকে ছুটে যায়
কোন মর্মস্পর্শী মুহূর্ত নিজের হত্যার যজ্ঞ থেকে
বের হবার পথ দেখে না, পায় না কোনো উপায়
কো্নো প্রতীকের কোথাও নেই যে খোঁজ আজ
কোনো ইঙ্গিতের পাওয়া যায় না যে কোনো সন্ধান ।

এমন দৃশ্য যেখানে দৃষ্টি গেছে আটকে
এমন প্রেক্ষাপট যেটা বিঁধে আছে যে চোখে
তাপের ছড়া-ছড়ি নিঃশ্বাসের ভিতরে
ঊষার রঙ উড়ে বেড়ায় যে প্রমত্ত চোখে
কোনো একটি বস্তু হামাগুড়ি দেয় মনের নির্জনতায়
কোনো একটি বস্তু লাফ দিয়ে বেড়ায় যে চোখে।

এমন রাজকীয় ভাবেই হয় যে আগমন
আকর্ষণ নিজের সংঘর্ষের দিকে যায় ছুটে
নিজের দেশকে নিজেই করে যে দখল
নিজের জনগণকে নিজেই বানায় যে জিম্মি।

জয়-পরাজয়

আমি চোখের পাপড়িতে যদি প্রহরী বসিয়ে রাখতাম
তুমি আমার স্মৃতির জানালা দিয়ে প্রবেশ করতে কী করে
আমি বাউন্ডুলে বাতাসের মতো যদি না ঘুরে বেড়াতাম
তুমি আমার নিঃশ্বাসের জোয়ারে পুস্পিত হতে কী করে
আমি অনুসরনের সূর্য যদি নিভিয়ে না আসতাম
তুমি আমার বাসনার বাগানে প্রস্ফুটিত হতে কী করে

আমি তো সেই পাথর যেটা ইতিহাসের আয়নায়
প্রতিটি ঐতিহাসিকের চোখে আমি সুপ্রত্যক্ষ থেকেছি
এটা ঠিক আমি নিমজ্জিত ছিলাম এই পৃথিবীর সাত রঙ্গে
তবুও পোশাক আমার ফেরেশতার মতো ধবধবে সাদা রেখেছি
মৃত্যুর উপত্যকায় আমি তো ঘুরেছি উন্মাদের মতো
তবুও আমি যুগে যুগে সভ্যতার রাজপুত্র বিবেচিত হয়েছি

যুদ্ধে জয়ী হয়েছি তখন তরবারির অহংকার গুড়িয়ে দেয়ার জন্য
আমি পরাজিতদের মাঠে আমার পতাকা উড়িয়ে দিয়েছি
যুদ্ধে পরাজিত হয়েছি তখন পরাজয়কে জয় বানানোর জন্য
আমি বিজেতার সভ্যতায় আমার পদচিহ্ন এঁকে দিয়েছি।
নতুন পৃথিবী

পরিচয়

তুমি আমাকে কোন প্রশ্ন করলে না
আমারো ছিল না কোন জিজ্ঞাসা
কিছু সম্পর্ক এমন হয় যেখানে
নেই প্রয়োজন কোন জিজ্ঞাসার
গন্তব্যের চিন্তা না করেই হেঁটে যাই আনমনে
এমনো পথ আছে যেখানে হাঁটতে হয় কিছু না ভেবে।

এমনিও সবাই পায় স্বপ্ন বুনার সময় ও সুযোগ
যখনই অবসর মেলে রেশমী সুতোয় লাগাই জোড়া
কখনো কখনো এক গিঁটের উপর বসাই নতুন গিঁট
আবার সুযোগ পেলে ছিড়ে ফেলি কোমল গিঁটগুলা।

কোন পরিকল্পনা কাজে লাগে না এই কর্মে
কোন প্রতিজ্ঞা এই উন্মাদনায় লাগে না কাজে
পথ চলতে দৃশ্য দেখার কার আছে অবসর
কোন দৃশ্যপট দৃষ্টি আকর্ষণ করে না আর।

কিছু পরিচয় দূর দিগন্তে হয় প্রতিপালিত
উপাসনায় নিছক সংবাদের নেই কোন মূল্য
তা হলে বল আমি কি প্রশ্ন করতাম তোমায়
আর আমার কাছে তোমার কি বা থাকতো জিজ্ঞাসা
উপাসনায় পরিচয়ের হয় না যে কোন প্রয়োজন।

আহমেদ ইলিয়াস এর কবিতা

আলো সবার জন্য

মূল উর্দু থেকে ভাষান্তরঃ হাইকেল হাশমী

ভোরের কিরণ হলো আলো
আলোকে করা যায় না বিভাজন
কারো দখলে নেই
ভোরের কিরণ।

ভোর যখন হয় তখন আলোর জোয়ার
ছড়িয়ে পড়ে সুগন্ধীর মতো
দু:খে ঢাকা মুখমন্ডলের উপর
জায়গায় জায়গায় ছিটানো রাতের আঁধারের উপর।

আলোকে করা যায় না বন্দী
আলো কারাগারের ফাঁক-ফকর দিয়ে আসে বেড়িয়ে
বিনিদ্র চোখের মণিতে
প্রিয়ার সৌন্দ্রজে
ঠোঁট আর গালের সজ্জায়।

আলো তোমার জন্য, আলো আমার জন্য
আলো দিনের জন্য, রাতের জন্য
বন্ধ চোখের জন্য, খোলা ঠোঁটের জন্য
আলো সবার জন্য।

আনোয়ার ঘানির কবিতা

বাংলা ভাষান্তরঃ গৌরাঙ্গ হালদার

যুদ্ধের পুত্র

শৈশব থেকে আমি খুঁজছি আমার মুখ

মুখ চুরি করে নিয়ে গেছে যুদ্ধ

আমি যুদ্ধের পুত্র

আমার হৃদয় এক অন্ধ মরুভূমি

আমার স্মৃতি একটি ভাঙা আয়না

আয়না টুকরো টুকরো হয়ে গেছে

কঠিন যুদ্ধের নাচে।

আমি এক ইরাকি লোক

আমার জীবন মুলতুবি করা হয়েছে
আমার দৃষ্টি সৌন্দর্যের কিছু জানে না
আমার স্বপ্নের পিরাণ খুব ছোট
আমার হাত জনশূন্য রাস্তার মতো ফাঁকা
আমার কামনা কেবল রক্ত আর অশ্রুবিহীন ফোরাত দেখা
আমি বাঁচতে চাই মিসাইল বিহীন শিম ক্ষেতের মাঝে
মিসাইল ভেঙ্গে দিয়েছে ব্যাবিলনের পাজর
যুদ্ধের কন্যা ব্যাবিলন, তুমি তো আমারই মতো
তোমার মুখ নেই, স্বপ্ন নেই
তুমি ঘুমাও শুকনো মাঠে হাসি ছাড়া।

ধ্বংস করে দেয়া দেশের লোক আমি
যুদ্ধের দেশের মুখবিহীন লোক আমি
এখানে নেই কোনো গোলাপ
পাখিরা তাদের গান ভোলার কথা ভেবেছে
এখানে নেই কোনো ঠোঁট
ফোরাত নিজেই বেঁকে গেছে
একটি বাদামি সজারুর মতো।

ইরাকে সূর্য হলুদ নয়
ধোঁয়া তার গালে লেপে দিয়েছে কালো রঙ
চাঁদ এখানে ফ্যাকাশে আর আমি

এই ভচকানো দুনিয়ায় শেষ প্রেমিক।

আমার হৃদয়ের দিকে তাকাও

তুমি দেখবে তা শূন্য

আমার চোখের দিকে তাকাও

তুমি দেখবে তা অন্ধ ও লাল

ইরাকে কোনো সুন্দর নেই

আমাদের নারীরা ভুলে গেছে তাদের প্রদীপ্ত ত্বকের কথা।

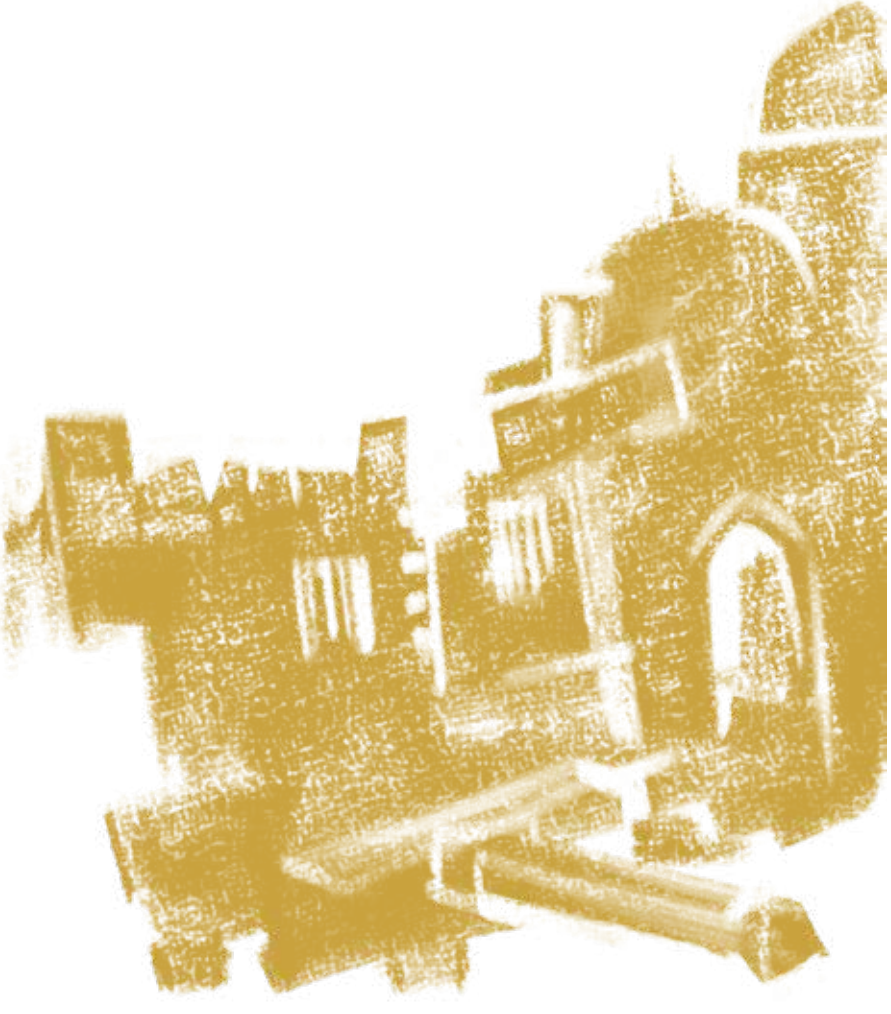

আমি অন্ধ একটি গাছ

সন্ধ্যার মৃদু সমীরের গুঞ্জন আমি জানি না

আমি জানি শুধু এই জগতের

জীর্ণ ধ্বংসের অবশেষ

ধরে রাখার ব্যর্থ চেষ্টা।

আমার পাতাগুলো বিবর্ণ

আমার স্বপ্ন বসে আছে সূর্যাস্তহীন আবছা সন্ধ্যায়

অন্ধ দরোজার কাছে।

ধূসর পাখিটা তার মিলিয়ে যাওয়া ফিসফিস ভালবাসে

তবে যখন সে খোঁজে তার বাস্তব মুখ

দুঃখী শাখা প্রশাখা ছাড়া সে পায় না কিছু আর।

কবি পরিচিতিঃ

জন্মঃ আনোয়ার ঘানি'র জন্ম ১৯৭৩ সালে। ইরাকের ব্যাবিলনে। একাধারে কবি চিকিৎসক ও হাদিসবেত্তা। আরবি ও ইংরেজি –দুই ভাষাতেই লেখেন। প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ৮০। নিজের দেশ সহ ইউরোপ, আমেরিকা ও এশিয়ায় ৫০ টিরও বেশি পত্রিকায় লেখা ছাপা হয়েছে। দেশে-বিদেশে অনেকগুলো সম্মানজনক পুরষ্কার পেয়েছেন। ইংরেজিতে সবচেয়ে বেশি পঠিত কাজের মাঝে 'আই অ্যাম অ্যান ইরাকি ম্যান'; 'ইট ইজ আ ম্যাটার অব লাভ'; 'মঞ্জুনাথ'; 'ট্রাভেল'; 'রেইন শাওয়ার্স'; 'হি ইজ আ সোলজার'; 'আ ফার্মারস চ্যান্টস'; এবং 'কালার্ড হুইসপার্স' উল্লেখযোগ্য।

মার্গারেট অ্যাটউড এর কবিতা

ভাষান্তরঃ নিশাত শারমিন শান্তা

বিবাহবসত

এ নহে সখা মাথার ওপর ছাদ,
নয়তো কোনো বেদুইনের তাঁবু
দোসরগাথা এসব আসর থেকে
একটু দূরে দাঁড়িয়ে জবুথবু
হিমেল হাওয়ায় জড়িয়ে আলোয়ান।

দাঁড়িয়ে থাকা বনের প্রান্ত ছুঁয়ে
মাখতে থাকা মরুঝড়ের বালি
সিমেন্টচটা একলা সিঁড়ির ধাপে
নিজের সাথে নিজের কাটাকুটি
যুগল জীবন ক্লান্ত করে প্রাণ?

হাঁটতে হাঁটতে আরও দূরের পথ
হাঁটতে হাঁটতে হিমনদীরই পার
ঠকঠকিয়ে কাঁপছি শীতে, দ্যাখো !
চকমকি হোক বাড়িয়ে দেওয়া হাত
যৌথআঁচে খুঁজি পরিত্রাণ।

প্রেমান্ধ

আমার মাঝে নিত্য তোমার বাস
বিদ্ধ কাঁটায় লিখছ সর্বনাশ
কাঁটা তো নয়, খোলা চোখের মাঝে
বড়শি গেঁথে দিচ্ছ সুতোয় টান

আমি তোমার ডাঙায় তোলা মাছ

এই ছবিটা আমার

ছবিটা তোলা হয়েছিল
অনেক দিন আগে।
প্রথম দেখায় মনে হতে পারে
রেখাগুলো ঘষে ঘষে কেউ
লেপ্টে দিয়েছে হলদেটে কাগজের গায়।

একমনে তাকিয়ে থাকলে
আধো আলো আধো ছায়া
সয়ে যাবে চোখে,
আর ছবির বাঁ কোণ ঘেঁষে
আড়মোড়া ভাঙবে একটা ডাল,
সেজে আছে সবুজ পাতায়।
কোন্ গাছ থেকে হাত বাড়িয়েছে
সেটা বোঝা না গেলেও
ডানদিকে ছুট লাগানোর তাড়াটা
চোখে পড়বেই ঠিকঠাক।
দৃষ্টি সে পথে ভাসিয়ে দিলেই
পথ আগলে দাঁড়াবে
শান্ত এক ঢাল
যাতে হেলান দিয়ে বসে আছে
ততোধিক শান্ত এক ঘর

না না, ঘরের ভেতর
উঁকি দেওয়ার দরকার নেই!
কেননা তার আগেই ছবিজুড়ে
লাফিয়ে উঠবে এক মায়াহ্রদ।
তাতে ছায়া ফেলবে
ফিরোজা আকাশ,
ধোঁয়াটে পাহাড় সারি।

(আমি জলে ডুবে যাবার পর
কে যেন তুলেছিল ছবিটা।
ওই যে গহীন হ্রদ,
ওই যে টলটলে জল,
তার মাঝেই তো
শুয়ে আছি আমি!!
ছবিতে অবশ্য একটা ঢেউও
দেখা যাচ্ছে না
স্তব্ধ, স্থির,
কিন্তু, তাতে কী??
আপাতশান্ত ওই স্তব্ধতার নীচেই তো
লুকিয়ে রেখেছি সব কথা,
সব ব্যথা,
পাওয়া-না পাওয়ার যত
যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ

অত আঁতিপাতি করে

খুঁজলেই কি মেলে সব?

এত গভীর থেকে

কিভাবেই বা বোঝাই

কোন্ অতলে

আছি?

কিভাবে আছি?

আর কে না জানে,

আলো আর জল হাতে হাত রাখলেই

বিভ্রম জন্মায়?

সে একটু বিভ্রম রইলোই বা?

শুধু একটুখানি সময়,

একটু মনোযোগ দিয়ে

ছবিটায় চোখ রাখলে

আমাকে দেখতে পাবেই,

নিশ্চিত)

কবি পরিচিতিঃ

মার্গারেট অ্যালেনর অ্যাটউড একজন কানাডিয়ান কবি, ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক ও সাহিত্য সমালোচক। ১৯৩৯ সালে জন্ম নেওয়া এই লেখিকা তাঁর ৮২ বছরের জীবনে লিখেছেন ১৮টা কবিতার বই, ১৮টা উপন্যাস এবং অসংখ্য ননফিকশন আর বাচ্চাদের বই। বিভিন্ন পুরস্কারের পাশাপাশি দুইবার বুকার পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন তিনি।

কুনবর নারায়ণ এর কবিতা

হিন্দি থেকে ভাষান্তরঃ অজিত দাশ

এক জীবন কেটে গেল

এতকিছু ছিল জগতে—

লড়াই-ঝগড়ার জন্য অথচ

এমন মন পেলাম—

এক ছটাক প্রেমেই মশগুল

আর ফিরে দেখি,

এক জীবন কেটে গেল।

তুমি আমার চারপাশে

তুমি আমা চারপাশে প্রতিটি মুহূর্ত—
এতটাই উপস্থিত আমার দুনিয়ায়
তোমার প্রতিনিয়ত আনাগোনা
তবুও আমার তোমাকে ঠিকমতো
চিনতে না পারার অক্ষমতা—চাইলে তোমাকে
বলতে পারি না, দেখো—এটাই আমার পরিচয়
কেবল আমার, একান্ত আমার
একদম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত
যেকোনো দৃশ্যমান বস্তুর মতোই স্পষ্ট এবং নিশ্চিত

আর এখন তোমাকে চিত্রিত করতে
আঙুলের মিহি রঙের স্পর্শ, ক্যানভাস
আমার চিরচেনা দৃশ্যের প্রকাশ ভাষার মাঝখানে
নীরব এক শূন্য জায়গায় পড়ে আছে।
স্তব্ধ জলের গভীর নিমজ্জনে
এক ছায়ার সংকুচিত স্তর; যেন ঘনিয়ে আসা
সন্ধ্যার অন্ধকারের অবয়ব, ঠান্ডা হাত।
আমার কাঁধে বরফের স্পর্শের
মতো অনুভূত হচ্ছে।

অঙ্গ-অঙ্গ

প্রতিটা অঙ্গ
তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল

অগ্নিকে
জলকে
পৃথিবীকে
হাওয়াকে
মহাশূন্যকে

শুধু একটা বই বেচে গিয়েছিল
এমন একটা খেলাও
যেটা সে শৈশব থেকে এখনো
খেলে আসছিল

সেই বইটাকে রেখে দেওয়া হলো
খালি পায়ের নিচে
তার জায়গায় অন্য কাউকে খুশি করার জন্য

অসুস্থ নয় সে

অসুস্থ নয় সে
কখনো-কখনো অসুস্থতার ভান করে
তাদের খুশির জন্য
যারা সত্যি সত্যি অসুস্থ হয়ে আছে

কোনোদিন মরেও যেতে পারে সে
তাদের খুশির জন্য
যারা মৃত্যুর কোলে পড়ে আছে

কবিদের কোনো ঠিকানা নেই
না জানি কতবার তারা
নিজের কবিতায় মরে আর বাঁচে।

তাদের মরে না যাওয়ার উদাহরণও রয়েছে
তাদের খুশির জন্য
যারা কখনো মরে যায় না।

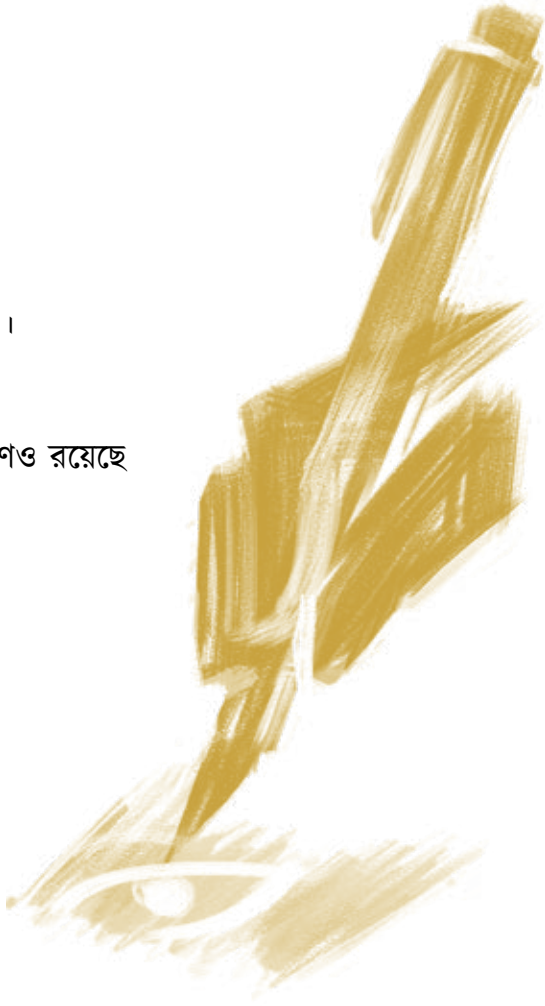

সমুদ্রের মাছ

এই তো সেখান থেকেই ফিরে এসেছি
নিজেকে অপূর্ণ রেখে
যেখানে রয়েছে—মিথ্যে, ভীরুতা, অন্যায় আর মূর্খতা—
প্রতিটি বাক্যকে ভেঙেচুরে, প্রতিটি শব্দকে একা ছেড়ে
নির্দয় অসুখের একচ্ছত্র অনুশাসনে
কোনোভাবে পুনরায় শুরু করতে যাচ্ছি

খবরের কাগজের শব্দগুলোর ভিড়ে
অনেক মুখছবির মাঝে কোনো এক ছবিকে
অপরাধীর মতো সাব্যস্ত করতে থাকি বার বার
অদ্ভুত রকমভাবে বেঁচে থাকার এক প্রবল চেষ্টায়—

কিন্তু প্রতিবার প্রায়শ্চিত্ত শেষে এক ভিন্নরকম যাতনায়,
সেখান থেকেই ঘুরে দাঁড়াচ্ছি যেখানে ভেঙে পড়েছি,
সেই নির্দয় পৃথিবীর অনিয়মিত প্রতিফলনে
নির্মম বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা ভেঙে যাচ্ছে,
কোনোরকম বেঁচে থাকার জন্য ছুটে বেড়াই
এক থেকে দুইয়ের দিকে অথবা নিজেকে ছেড়ে
কোনো নতুন দিকে এত ছুটাছুটি করে নেই মাছের মতো
আর এভাবেই শুরু হয় অবিরাম ছুটাছুটি
এক সমুদ্র থেকে আরেক সমুদ্রের দিকে...

ভালোবাসার সৌজন্যে

গাছের গুঁড়িতে পেঁচিয়ে থাকা
কুমারী লতা
দু চোখ বিশ্বাস করো—
আজন্ম তৃষ্ণায় মেঘের ঘনঘটা
লাফিয়ে লাফিয়ে পড়ছে নগ্ন বিজলি
শুকনো পৃথিবীর মাটির বুকে
এ যেন সৃষ্টির আভাস বর্জিত গর্ভে
তুষ্টির অপকীর্তি—
কলঙ্কিত মালতীর দুগ্ধ কলি?

হাজার বছরের বৃদ্ধ মন্দির
তুমি চুপ থাক,
আত্মীয় হয় সে নাম যে অপরিচিত—
সে জিজ্ঞেস করলে পাপ হয়,
ফুল হলো তার খুশির দান
সে জিজ্ঞেস করলে কি দাগ লেগে যায়!
পতিত পাবন বৎসলা ধরণী
তোমার পুত্র যে জন্ম নিয়েছে...

সাক্ষী রয়েছে,
ফুলদানিতে রাখা হাসনাহেনা ফুল
কুণ্ঠিত সভ্যতার স্ফুলিঙ্গের মতো!

বনজাত হলো সৌন্দর্যের ভাষা!

তাকে স্বতঃস্ফূর্ত থাকতে দাও

কত মনোযোগ নিয়েই না

এই গল্প শুনেছে তারাদের দল

ভালোবাসার সৌজন্যে।

কবি পরিচিতিঃ

কুনবর নারায়ণ [১৯ সেপ্টেম্বর ১৯২৬-১৫ নভেম্বর ২০১৪] হিন্দি সাহিত্যে নতুন কাব্য আন্দোলনের অন্যতম কর্মী । মাত্র ২৯ বছর বয়সে তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ চক্রব্যূহ প্রকাশিত হওয়ার পর সম্পাদক অজয় ১৯৫৯-এ তার সম্পাদিত আধুনিক হিন্দি কবিতা সংকলন সপ্তকে হিন্দি সাহিত্যের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কবি, কেদারনাথ সিংহ, সর্বেশ্বর দয়াল সাক্সেনা, বিজয়দেব নারায়ণ শাহির সঙ্গে কুনবর নারায়ণের কবিতাও গুরুত্বসহকারে অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি ২০০৯ সালে ভারতীয় সাহিত্যের সর্বোচ্চ সম্মান জ্ঞানপীঠ পুরস্কারে ভূষিত হন। তার উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলো হলো,চক্রব্যূহ্, তিসরা সপ্তক, পরিবেশ-হাম-তুম, আপনে সামনে, কই দুসরা নেহি এবং কবিতাকি বহানে।

কুনবর নারায়ণ তার রচনায় ইতিহাস এবং পুরাণের মিশ্রণের মাধ্যমে বর্তমানকে নতুন করে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করেছেন। যদিও তার মূল ঘরানাটি কবিতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কবিতা ছাড়াও তিনি ছোটগল্প, গদ্য এবং আলোচনার পাশাপাশি সিনেমা, নাটকও রচনা করেছেন। ভাবনার সঙ্গে ভাষার সরলতা এবং রচনা শৈলীর কারণে তাঁর লেখার সঙ্গে পাঠকের সহজে যোগাযোগ তৈরি হয়। কবিতার পাশাপাশি চিত্রনাট্য ও গল্প নিয়ে পরীক্ষামূলক কাজও করেছেন। তাঁর কবিতা ও গল্প বহু ভারতীয় ও বিদেশি ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে।

অশোক বাজপেয়ির কবিতা

মূল হিন্দি থেকে ভাষান্তর অজিত দাশ

কেউ আমরা জানি না

কেউ আমরা জানি না
আর ক'দিন আছে আমাদের হাতে!
মুখে খাবারের টুকরো নিয়ে
নীড়ফেরতা কোনো পাখি,
হয়ত আনমনে বসে যাবে
বিদ্যুতের এক তারের উপর,
এবং আহ্লাদে ঝুঁকে পড়ে
ছুঁয়ে ফেলবে দ্বিতীয় তারও

শুকনো ডালে ধীরে ধীরে
সাড়ি বেঁধে চলা কোনো ক্ষুদ্র পোকা,
হয়ত লাকড়ি কুড়ানো এক বুড়ির
ছিঁড়ে জুতোর নিচে পিষে যাবে।

ট্রেনের ইঞ্জিন থেকে
দ্রুতগতিতে ছুটে আসা
কোনো স্ফুলিঙ্গ, হয়ত বিঁধে যাবে
উড়ন্ত প্রজাপতির বুকে।

কেউ আমরা জানি না
আর কতটুকু সময় আছে,
অপেক্ষা করার জন্য।
হয়তো প্রেম আসবে
একটি হলুদ খামে ভরে,
ডাকযোগে যেনো কিছুটা সময়
আরো বাকি আছে,
কাঁঠালের মুচি খাওয়ার
উপযুক্ত হতে; পৃথিবীকে পুনরায়
সবুজ প্রাণবন্ত এবং দয়ালু
হয়ে উঠতে, কিছুটা সময়
আরো বাকি আছে।

দরজায় কড়া নড়বে
আর সে বলবে-চলো,
তোমার সময় হয়ে গেছে।
কেউ আমরা জানি না
আর কতটুকু সময় আছে-
তোমার না আমার।

সে আসবে
যেমন করে আলো আসে
যেমন করে মঘ ছেয়ে যায়,
ফুলের মতো খিলখিলিয়ে

হাসে ছোট্ট শিশু,

যেমন করে অন্ধকারে ভয়

জাগিয়ে দেয় শুন্য ঘর।

সে আসবে নিশ্চিত!

কিন্তু তার আসার জন্য

আর কতটুকু সময় বাকি আছে

কেউ আমরা জানি না।

শুধু শব্দ দিয়েই নয়

শুধু শব্দ দিয়েই নয় স্পর্শবিহীন ছুঁয়ে,
স্পর্শবিহীন চুমু খেয়ে, জড়িয়ে ধরে
দূর থেকে ফুলের পাপড়ির মতো খুলে খুলে,
না দেখে কল্পনায় এনে- আমিও তাঁকে বলেছি।

প্রার্থনা সংগীত

সময় বদলাক আর না বদলাক,
ভরসার একটা জানালা অন্তত
খোলা রাখা চাই।

হয়তো কোনো নারী
বাসন্তী কাপড়ে, নাম না জানা
বৃক্ষের নিচে অজ্ঞাত দেবতার উদ্দেশে
ফুল-চন্দন রেখে যাবে।

হয়তো কোনো শিশুর খেলনা
হারিয়ে গিয়ে আমাদের ঘরে
এসে পড়বে এবং সেটি
ফিরিয়ে দিতে হবে।

হয়ত দেবাসুর সংগ্রামে,
রক্তাক্ত হয়ে কোনো প্রাচীন শব্দ
পৃথিবীর নিষ্ঠুর বাস্তবতায় ম্লান হয়ে,
কোনো কবিতার উষ্ণতায়
সামান্য বিশ্রাম নিতে চাইবে।

আমি আমার সময়কে
প্রতিযোগীতায় লাগিয়ে দেব।

বাজিতে লাগিয়ে দেব আমার
সব শক্তি, সাহস আর আকঙ্খা।
তারপরও অন্তত
ভরসার একটা জানালা তো
খোলা রাখা চাই।
যেনো হেরে যাওয়ার আগে,
নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার আগে
অন্ধকারে নিজের শেষ অস্ত্রের
দিকে তাকিয়ে-আরো একবার,
বেঁচে থাকার গান গাইতে পারি।

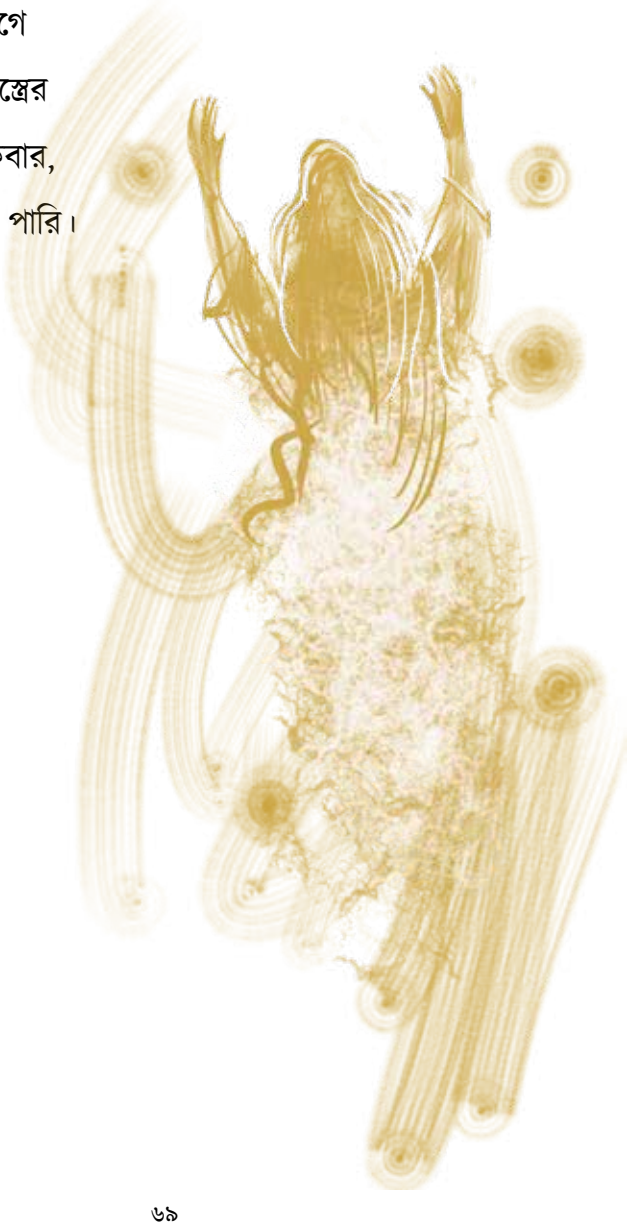

নীলিম কুমার এর কবিতা

মূল অহমিয়া থেকে ভাষান্তরঃ বাসুদেব দাস

মায়া

আমার ঘরের হেলানো ছায়ার নিচে অপেক্ষা করছিল মায়া।
তার গন্ধ পেয়ে আমি কাছে গিয়েছিলাম।
খামচে ধরেছিলাম মোমের মতো মসৃণ তার দুটি হাত।
আমার কানে আলগোছে ঠোঁট দুটি গুজে সে ফিসফিস করে
যে কথা বলল মটমট করে ভাঙতে শুরু করল আমার ঘর
খসে পড়ল চালের সঙ্গে সিলিং, টুকরো টুকরো হয়ে গেল
চারটে খুঁটির সঙ্গে আমার বিছানা,ইস আস করতে লাগল
কাপড়ের সঙ্গে ছিন্নভিন্ন হওয়া আমার আলনাটা
খান খান করে ভেঙ্গে গেল আমার কাচের আলমারি,ছিটকে পড়ল
আলমারিতে থাকা বই মাটির ফুলদানি মাটির পুতুল
কালির দোয়াত। অভিমানে ঝনঝন করে ভেঙ্গে গেল
আমার প্রিয় আয়না ছিটকে পড়ল চেয়ার টেবিল,টেবিলের ওপরের
গ্লাস জলের বোতল চশমা । জ্বলে উঠলন
রান্নাঘরের সমস্ত বাসনপত্র অদ্ভুত ভাঁজ ধরে বাসনগুলি
ঠনঠন করে
উঠল বন্দি জল মুক্ত হল বালতি গড়িয়ে-
ঘেউঘেউ করে উঠল আমার সবচেয়ে আদরের পোষা কুকুরটা...

মায়া আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল-
‘এই ঘর মিথ্যা, আগুন জল বাতাস আকাশ সমস্তই মিথ্যা
এই জগত মিথ্যা’

আমি ভাবলাম-তাহলে আমিও মিথ্যা,এই কুকুরটাও মিথ্যা-যে
ঘেউ ঘেউ করছে। ভাবার সঙ্গে সঙ্গে কুকুরটা আমাকে কামড়ানোর জন্য
তেড়ে এল। দৌড়ে দৌড়ে আমি পালাতে লাগলাম । কিন্তু
কুকুরটা আমার পায়ে কামড়ে ধরল এবং জিজ্ঞেস করল-
'যদি তুমিও মিথ্যা, আমি ও মিথ্যা, তাহলে আমার ভয়ে
তুমি পালাচ্ছ কেন?'

মায়া আমার দিকে চোখের ইশারা করল আর আমি বললাম
যে এই পালানোটাও মিথ্যা

পাখা

আমি পাখা নিলেই
বাঁশগাছের ঝরাপাতার নিচে
শুয়ে থাকা বাতাস
সুরসুর করে চলে আসে
আমার পাখার বাতাস হওয়ার জন্য

আমি পাখা নিলেই
ধানখেত থেকে
ঝির ঝির বাতাসও চলে আসে
আমার পাখার বাতাস হওয়ার জন্য
সরষের ফুলের মধ্যে খেলতে থাকা
হলদে বাতাসও চলে আসে
আমার পাখার বাতাস হওয়ার জন্য

আমার পাখার বাতাস হওয়ার জন্য
গাছের খোড়ল থেকে নেমে আসে বাতাস
পাখির বাসা থেকে নেমে আসে বাতাস
নদীকে ছেড়ে চলে আসে নদীতীরের বাতাস

একদিন দেখলাম -
আমার বিছানায় পড়ে থাকা পাখাটার কাছে এসেছে
এক ঝাক সামুদ্রিক বাতাস

আর কাকৃতি মিনতি করে পাখাকে বলছে –

‘আমাকেও হতে দাও তোমার বাতাস

তোমার বাতাস...’

কে তৈরি করেছিল এই পাখা

পাখা তৈরি করার সময় কে

কী যাদু মাখিয়ে দিয়েছিল আমার পাখায়?

কী যাদু মাখিয়ে দিয়েছিল

কী যাদু মাখিয়ে দিয়েছিল?

কবি পরিচিতি

সাম্প্রতিক অসমের অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং বিতর্কিত কবি নীলিম কুমার ১৯৬২ সনে অসমের বরপেটায় জন্মগ্রহণ করেন। পেশায় চিকিৎসক। প্রকাশিত গ্রন্থ ‘আচিনার অসুখ’,’স্বপ্নর রেলগাড়ী’,’জোনাক ভালপোয়া তিরোতাজনী’,’নীলিম্ম কুমারর শ্রেষ্ঠ কবিতা’ ইত্যাদি।

ভাষান্তরিত প্যারাবল

সোরেন কিয়ের্কেগার্ড এর ১০টি প্যারাবল

ভাষান্তর: রফিক জিবরান

অস্তিত্ববাদী দার্শনিকধারার স্রষ্টা গণ্য করা তাঁকে। জীবনাচারনকে তিনি দার্শনিক উপলব্দির সাথে মিলিয়ে দেখেছেন. যদিও তাঁর চিন্তার মূল গতিপথ প্রধানত বাইবেল এবং যিশু কেন্দ্রীক, আবার গ্রীক সভ্যতার অন্দরে শুধু ঢুঁ মারেননি, সেখানেই যেন বসবাস করেছেন। তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহ জীবিতকালে তেমন পঠিত হয়নি। মৃত্যুর প্রায় শত বছর পরে তার নবজন্ম ঘঠে প্রথমে জার্মানিতে, পরে সমগ্র ইউরোপে। দার্শনিক জ্ঞিজ্ঞাসা এবং চিন্তার কুহেলিকার ভেতরে সাধারণের প্রবেশ সহজ করার লক্ষ্যে তিনি ইউরোপীয় সভ্যতার গভীর থেকে তুলে আনতেন এমন সব গল্প, যার ভেতরে সভ্যতার অভিজ্ঞতাসমূহ প্রবাহিত হচ্ছে প্রজন্ম পরম্পরায়।

টমাস সি. ওডেন সম্পাদিত 'প্যারাবলস্ অব কিয়ের্কেগার্ড', থেকে ১০টি প্যারাবল বাংলায় ভাষান্তর করেছি, আশায় আছি পুরো বইটি হয়তো শেষ করা যাবে।

‘

১.

পোড়াদহের সুখীরা

কী হয়েছে তাদের ভাগ্যে; বর্তমানকে যারা সতর্ক করেছিল?

একটা নাট্যমঞ্চের ঠিক পেছনেই আগুন ধরেছিল। একজন কৌতুক-অভিনেতা সেই আগুন ধরার খবরটি দর্শকদের জানাতে আসে। খবরটাকে কৌতুক ভেবে দর্শকরা হাততালি দেয়। কিন্তু কৌতুক-অভিনেতা আগুন লাগার খবরটা বারবার জানাতে থাকলে দর্শকরা আরও জোরে তালি দিতে থাকে। এ কারণে আমি মনে করি, যারা বিশ্বাস করে যে ঘটনাটা একটা কৌতুকই ছিল, তাদের হাততালির কাছে হয়তো দুনিয়ার তাবৎ বুদ্ধিবিবেচনার অবসান হবে।

২.
কবি কে?

কবি হচ্ছে এমন একজন অসুখী মানুষ, হৃদয় যার গভীর বেদনায় দগ্ধ। কিন্তু তার ঠোঁটটা এমন ছাঁচে গড়া যে, তার কান্না ও হাহাকার মানুষের কাছে মধুর ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়। তিনি সেই হতভাগা মানুষদের মতো যারা পরাক্রমশালী শাসক ফালারিসের প্রতিহিংসার শিকার হয়ে মৃত্যুকুঠুরিতে বন্দী থাকে, আগুনের শিখায় ধীরে ধীরে দগ্ধ হয়, তবু তাদের কাতর কান্না শাসকের কানে পৌঁছে না। কেননা এতে সম্রাটের মনে ভীতির সৃষ্টি হয়। কিন্তু যখন তার কানে শব্দগুলো পৌঁছে তখন তা মধুর সঙ্গীত মনে হয়। আর লোকেরা কবির সামনে ভীড় করে বলে, "আমাদের জন্য আবার গান করো শিগগির"। বা হয়তো তারা বলতে চায়, " নতুন বেদনায় তোমার হৃদয় পুড়ে যাক, কিন্তু তোমার ঠোঁট গেয়ে উঠুক মধুরধ্বনি, আগে যেমন গাইতে তোমার অনিন্দ্য সুন্দর কণ্ঠে। কান্না আমাদের ব্যথিত করে, কিন্তু সঙ্গীত দেয় অপার আনন্দ।" সমালোচকেরা এমন সময় এগিয়ে এসে বলে, ‘‘দারুণ সুন্দর হয়েছে, নন্দনতত্ত্বের বিধান মেনে এমনই হওয়া উচিত।" এটা বোঝা গেল যে, সমালোচক কেবল কবি’র বহিরঙ্গ দেখেছেন, হৃদয়ের তপ্ত আগুনের খোঁজ পাননি বা তাঁর ঠোঁটে উচ্চারিত সঙ্গীতের মাধুর্য বুঝেননি। আমি এ কারণে বলতে চাই যে, কবি হয়ে মানুষের
ভুল বুঝাবুঝির শিকার না হয়ে
একজন শূকরপালক হতে চাই যার
কথা শূকরেরা অন্তত ভাল বুঝবে।

৩.

একজন ব্যস্ত দার্শনিক

সমাজের সবাই যখন যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়, দার্শনিকের কী কিছু করার থাকে?

রাজা ফিলিপ কোরিন্থ নগরী অবরুদ্ধ করার হুমকি পাবার পর এর সকল বাসিন্দা নগরের নিরাপত্তা বিধানে লেগে যায়—কেউ অস্ত্র শান দিতে শরু করে, কেউ পাথর স্ংগ্রহে, কেউবা নগরীর নিরাপত্তা দেয়াল মেরামতে। দার্শনিক ডায়োজিনিস এসব কাজকর্ম দেখে তাড়াতাড়ি নিজের কাপড়ের পুটলি ভাঁজ করতে শুরু করে এবং শহরের রাস্তায় সেটা গড়াতে শুরু করে। এটা কেন করছেন জিজ্ঞেস করা হলে বলেন— তিনি কাপড়ের পুঁটলিটা ঘোরান এজন্য যে নগরীর পরিশ্রমী নাগরিকদের মধ্যে যেন একমাত্র অলস বলে গণ্য না হোন।

৪.

অগ্নিশলাকা তুল্য পন্ডিতেরা

সাংবাদিকতার মতামত-পন্ডিতদের আমরা কীসের সাথে তুলনা করব যাঁরা জগতের সমস্ত বিষয়ে তাৎক্ষণিক দৃষ্টিভঙ্গি হাজির করতে পারে?

...তাদের তুলনা করা চলে একসাথে বিক্রি হওয়া অগ্নিশলাকার সাথে। এ লেখকেরা হলেন সেই গোত্রের যাদের মগজ বন্ধক থাকে এ রকম দাহ্য পদার্থের ভেতর (একটি প্রকল্পের ধরনে যেমন)। কেউ একজন সেখানে পা দিয়ে আঘাত করে, আর সংবাদপত্রের পাতায় পয়দা হয় তিনচার কলামের লেখা। আর এইসব অনুমান-নির্ভর লেখকদের সাথে অগ্নিশলাকার আশ্চর্য মিল— উভয়েই ক্ষণিকের তরে জ্বলার পর মুহূর্তে মিলিয়ে যায় ধোঁয়ায়।

৫.

একজন ব্যস্ত লেখক যে যথেষ্ট দ্রুত লিখতে পারে না

অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী লোকদের মোকাবেলা করার উপায় কি?

কয়েক বছর আগে একজন লোক আমাকে তার বিশ্বাস রেখে সম্মানিত করেছিল। সে আমাকে ডেকে বলে যে, তার মাথায় নানান রকম চিন্তা ভর করেছে, কিন্তু তিনি কিছুই লিখতে পারছেন না। কেননা দ্রুত লিখতে পারেন না। তিনি আমাকে অনুরোধ করেন যেন অনুগ্রহ করে আমি তার সচিব

হই এবং তার নির্দেশনা মোতাবেক লিখে দেই। আমি সাথে সাথে একটা অন্য কিছুর আঁচ পেলাম তবে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম যে, আমি পাগলা ঘোড়ার মতো দ্রুত লিখতে পারি। আমার সামান্যই লেখার অভিজ্ঞতা, তবু আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলাম যে, আমি যা লিখবো তা পড়ে শোনাব। তার সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করার ক্ষেত্রে আগ্রহের কোনো কমতি ছিল না, একটা বড় টেবিল জোগাড় করেছিলাম, নম্বর দেয়া অনেকগুলো সাদা কাগজের পাতা— এজন্য যে, পৃষ্ঠা উল্টানোর জন্যও যেন সময় নষ্ট না হয়, অনেকগুলো কলম এবং কলমদানি, কলমটি ডুবিয়ে নিলাম কালির দোয়াতে আর লোকটি বলা শুরু করল— "আচ্ছা, ঠিক আছে, আপনি জানেন, প্রিয় স্যার, আসলে আমি যে কথাটি বলতে চাই তা হলো...." কথা বলার মাঝখানে আমি তার বলা এই কথাগুলো পড়ে শোনালাম, আর তারপর থেকে তিনি আর কখনোই আমাকে তার সচিব হওয়ার জন্যে বলেননি।

৬.

ফরাসি রাষ্টনায়ক

দায়িত্বহীন ক্ষমতা কী থাকতে পারে?

আমাদের স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে ঘটনাটি। একজন ফরাসি রাষ্ট্রনায়ককে দ্বিতীয়বারের মতো একটি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেয়া দেয়া হলে তিনি ঘোষণা করেন যে, ক্ষমতা গ্রহণ করবেন যদি রাষ্ট্রের সচিবকে এ জন্য জবাবদিহি করার ব্যবস্থা করা হয়। এ কথা সকলেই জানে যে, ফরাসিদের মন্ত্রীরাই দায়িত্ব গ্রহণ করেন, রাজা নন। কিন্তু মন্ত্রীরা আবার দায়িত্বটা সচিবদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়। সচিবরা আবার সে কাজের দায়িত্ব নিচের দিকের কর্মচারী বা পাহারাদারদের ওপর অর্পণ করে। ফরাসি রাষ্ট্রের এরূপ দায়িত্ব হস্তান্তরের কান্ডকীর্তি দেখে মনে হয়— দায়িত্ব গ্রহণের এ চিত্রটা নাট্যকার এ্যারিস্টফেনিসের কমেডি নাটকের উপযুক্ত বিষয় হতে পারে!

৭.

বজ্জাত কুকুর

পাবলিক আসলে কী বস্তু?

যদি'পাবলিক' হিসেবে যদি বেছে নিই এমন একজন মানুষকে, তবে হয়তো আমি ভাববো রোমানদের একজন সম্রাটকে, যে খেয়েদেয়ে মোটাতাজা হয়েছে, কিন্তু ভুগছে অবসাদ রোগে, যে কেবল ইন্দ্রিয়জ ভোগেই সুখ

খোঁজে, যেহেতু স্বর্গীয় বুদ্ধিজাত সুখ এ নরাধমে তেমন সুলভ নয়। তো, সে এ অবস্থার পরিবর্তন নিয়ে ভাবা শুরু করল। যদিও সে কুঁড়েদের চেয়েও খারাপ, কিন্তু সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করার নেতিবাচক বাসনা আছে। চিরায়ত লেখকদের যারা পড়েছেন জানেন যে, সময় কাটানোর জন্য সম্রাট সিজার কত কিছুই না করতেন। যেমন, যদি অন্যদের চেয়ে ভাল কেউ থাকত, হয়তো মহত্তম কেউ, তার পেছনে কুকুর লেলিয়ে দেয়া হতো, তখন শুরু হয়ে যেতো কৌতুক। কুকুরটা তাকে তাড়া করে, কামড়ে কাপড় ছিঁড়ে দেয়, সমস্ত রকম এমন অসুস্থ কান্ডকীর্তি চলতেই থাকে যতক্ষন না 'পাবলিক' ক্লান্ত হয়ে

ক্ষান্ত দেয়। এটাই একটা দৃষ্টান্ত পাবলিককে বুঝবার। ভাল এবং শক্তিমত্তরা ভুলভাবে চালিত হয়। কুকুর কুকুরই থাকে, যদিও পাবলিক তাদের তুচ্ছ জ্ঞানই করে। কিন্তু পক্ষসমূহকে একই মধ্যবিন্দুতে হাজির করে একটি তৃতীয় পক্ষ, একটা অদৃশ্য তৃতীয় পক্ষ। পাবলিকেরও কোন লাজশরম নাই। এই তো কুকুরটির অঙ্গভঙ্গকে তালি দিচ্ছে, কিন্তু তারা কুকুরটিকে কারো দিকে লেলিয়েও দেয় না, আবার তা বন্ধ করতেও বলে না।

যদি তাদের বিষয়ে বলা হয়, তারা বলবে, আরে- কুকুরটা আমার না। এটা বেওয়ারিশ। যদি কুকুরটিকে মেরে ফেলা হয় তারা বলবে, বদ কুকুরটাকে মেরে ভালই হয়েছে, সকলেই বলবে ওটাকে মেরে ফেলো, এমনকি যারা ওকে লেলিয়ে দিতো তারাও।

৮.
বেশ্যাবৃত্তির অনুমোদন
কাকে বলে কৌতুক?

যখন একজন নারী নিজেকে সর্বজনের বেশ্যা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করে, তখন সেটা বেশ হাশ্যকর।

কেননা, এর মাধ্যমে সম্মানজনক কিছু অর্জন করা কষ্টকর (যেমন যখন একজন পুরুষকে শিকারের জন্য নেতৃত্ব দেয়ার অনুমতি দেয়া না হয় তবে তা হাস্যকর নয়) আবার, অনুমতি চেয়ে প্রত্যাখ্যাত হওয়া- যা নিন্দিত। এটা একটা দ্বন্দ। এটা নিশ্চিত যে, যদি তিনি অনুমতি প্রাপ্ত হোন, তবুও তা হাশ্যকর। এখানে দ্বন্দটা আলাদা রকমের। তা হলো, আইনী কর্তৃপক্ষ তার অসম্পূর্ণতা প্রকাশ করে যখন এটি তার ক্ষমতা দেখাতে চায় অনুমতি প্রদান করে। আবার, এটিকে বৈধতা দিতে সক্ষম না হয়ে এটিকে অনুমতি প্রদানযোগ্য করে।

৯.
ঈশ্বরের একঘেয়েমি
একঘেয়েমি কী মানুষের বারমেসে সমস্যা?

ঈশ্বরেরা ভুগছিলেন একঘেয়েমিতে, তাই তারা সৃষ্টি করে মানুষ। আদম ছিলেন একা তাই তিনিও ছিলেন একঘেয়েমিতে আক্রান্ত। সৃষ্টি করা হলো ইভকে। [এ সময় থেকেই দুনিয়ায় একঘেয়েমি বা অবসাদ রোগের প্রবেশ্য এবং যে অনুপাতে মানুষ বাড়ে সেই একই অনুপাতে বাড়ে একঘেয়েমিও ।

আদম একাই অবসাদগ্রস্ত ছিলেন, তারপর ইভ ও হাওয়া একসাথে অবসাদে আক্রান্ত হলেন। তারপর আদম-হাওয়ার সাথে কেইন ও আবেল মিলে পুরো পরিবার । জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে, আর ক্রমে সমগ্র দুনিয়ার সকল মানুষ অবসাদে আক্রান্ত হয়। একঘেয়েমির সমস্যাকে পাশ কাটানোর জন্য তারা একটি টাওয়ার বানানোর ধারণায় একমত হয়। যেটি এমন উচ্চতা সম্পন্ন হবে, যেটা দিয়ে বেহেস্তে পৌঁছানো যায়। টাওয়ারটির উচ্চতার এমন চিন্তাও খুব বোরিং ছিল এবং এটা থেকে ধারণা করা যায় যে তাদের একঘেয়েমির মাত্রাটা কত ভয়ঙ্কর ছিল।

আমি কোন অনুসারী চাই না। তবে যদি আমার মৃত্যুশয্যায় কেউ উপস্থিত হয়, এবং আমি নিশ্চিত হই যে শেষ সময় এসে গেছে— তাহলে আমি

পরোপকারী প্রলাপের চাপে পড়ে তার কানে আমার তত্ত্বটি ফিসফিস করে বলতে পারি, যদিও আমি নিশ্চিত জানবো না যে তার জন্য আমি কোনো উপকার করেছি কি-না।

১০.

ব্যয়বহুল বই ক্রয়

যদি বিবেককে বোকা বানানো হয়, পরিশেষে কী সে প্রতিশোধ নেয়?

এটি সেই মহিলার মতো যিনি রোমান সম্রাট তারকুইনের কাছে বইয়ের একটি সংকলন বিক্রির প্রস্তাব করেন এবং কিন্তু যখন তিনি বইটির পুরো মূল্য দিতে অস্বীকার করেন তখন সেগুলোর এক তৃতীয়াংশ পুড়িয়ে ফেলেন কিন্তু দাবী করেন আগের দাবীকৃত মূল্য। এবং আবার যখন সম্রাট তারকুইন সেই পরিমাণ মূল্য দেবেন না বলেন তখন মহিলাটি বইগুলোর আরও এক তৃতীয়াংশ পুড়িয়ে ফেলেন এবং একই পরিমাণ মূল্য দাবী করেন। এটা শেষ হয় অবশেষে যখন সম্রাট শেষ তৃতীয় ভাগ বইয়ের জন্য পুরো অর্থই পরিশোধ করেন।

প্রবন্ধ

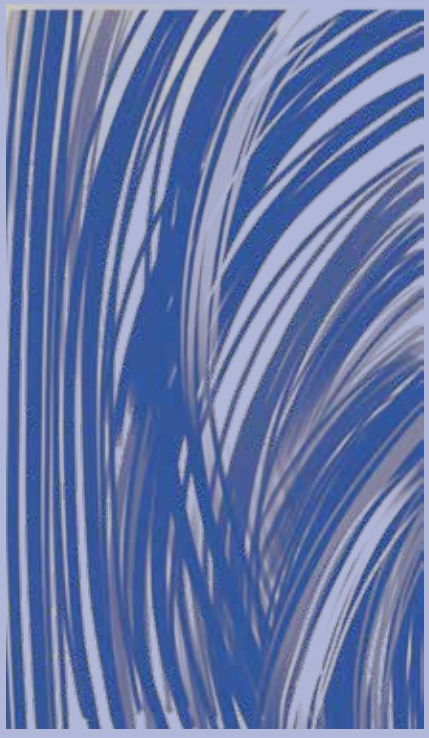

কবিতার অনুবাদ : প্রসঙ্গত কিছু কথা

স্বপন নাগ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কবি লুইস গ্লাক। নামটি আজ বিশ্বপরিচিত। বিশ্বনন্দিত। বাঙালি পাঠকও জানেন, 'অসামান্য কাব্যকণ্ঠ ও নিরাভরণ সৌন্দর্যবোধের মাধ্যমে ব্যক্তিসত্তাকে সর্বজনীন করে তোলার জন্য' ২০২০ সালে কবিকে নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়েছে। প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সৌজন্যে এ খবর আজ প্রায় সর্বজনবিদিত। মূলত আমাদের সাহিত্যতৃষ্ণার তাগিদেই আমরা ইতিমধ্যেই তাঁর কবিতা, তাঁর কবিতাকে নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা খুব সহজেই পড়ে চলেছি। খুব সহজেই, কেননা যারা ইংরেজি জানেন, তারা পড়ছেন মূল ইংরেজিতে ; অন্যেরা বাংলা অনুবাদে। এভাবেই তো আমরা পেয়েছি শেক্সপিয়ার, শেলী, কীটস্, ওয়র্ডসওয়ার্থ, ল্যাংস্টন হিউজ়, টি. এস. এলিয়ট প্রমুখদের মহান সৃষ্টিসমূহ। কিন্তু রমা রোলাঁ, রসুল গামজাতভ, ম্যাক্সিম গোর্কি, লু শ্যুন, জাঁ পল সার্ত্রে ... এঁদের সৃষ্টি ? ক'জনই বা জানেন রুশ, ফরাসি, চিনা বা জার্মান ভাষা ! ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই সব রচনার স্বাদ নিতে আমাদের শরণ নিতে হয়েছে অনুবাদের। অনুবাদ ছাড়া না-জানা ভাষার সৃষ্টির আস্বাদন একেবারেই অসম্ভব। তাই অনুবাদের হাত ধরেই সেই ভিন্ ভাষাটি বাংলায় রূপান্তরিত হয়ে চলে আসছে বাঙালি পাঠকের কাছে। বাঙালির চিরকালীন সাহিত্যপ্রীতির তাগিদেই সেই ভিনভাষী কবি-লেখকও তার সংগ্রহে অন্তর্ভুক্তি পাচ্ছেন।

আমাদের একই সঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, বিশ্ববরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্ব

জুড়ে পঠিত হয়েছেন মূলত অনুবাদের মাধ্যমেই। ফলে, অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা ও কার্যকারিতা নিয়ে কোনো প্রশ্ন থাকা সঙ্গত নয়। প্রশ্ন থাকতে পারে, অনুবাদে কি সেই আস্বাদন পাওয়া যায়, যা আছে মূলে ? এ বিষয়ে এর আগে বিস্তর আলোচনা হয়েছে। আলোচকের মতে, অনুবাদ সব সময় মূলের স্বাদ দিতে পারে না। এক্ষেত্রে দুটি ভাষার মেজাজ ও প্রয়োগ-বৈচিত্র্যের ভিন্নতা কখনো অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। প্রত্যেক ভাষার শব্দের নিজস্ব যে আবেদন, অনূদিত ভাষার শব্দে সেই একই আবেদন প্রকাশে কখনো সখনো আড়ষ্টতার একটি জাল সৃষ্টি করে, যাতে মূল থেকে মৃদু সরে আসার প্রবণতা তৈরি হয়।সেরকম ক্ষেত্রে অনুবাদকের দরকার হয় আরও একটু স্বাধীনতার ; দরকার হয় ভাষানুবাদের পরিবর্তে ভাবানুবাদের। সেই স্বাধীনতার বলেই অনুবাদক তখন কোনো শব্দের সংযোজন অথবা বিয়োজন করে নেন। সফল অনুবাদক তিনিই, যাঁর অনুবাদটি যত মূলের কাছাকাছি হয়। অর্থাৎ মূলানুগ হবার প্রচেষ্টাই একজন দক্ষ অনুবাদকের লক্ষ্য। এই মূলের কাছাকাছি মানে তার শব্দে, তার বাক্যগঠনে, তার কাব্যভাষায়। এত সব সত্ত্বেও কোনো কোনো কবিতা অনুবাদের সময় দুরূহতা সৃষ্টি করে মূলত দুটি ভাষার মেজাজের ভিন্নতা। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা অনূদিত হয় যে সাবলীলতায়, জীবনানন্দ দাশের কবিতায় সেই সাবলীলতা অর্জন তত সহজ নয়। 'পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে' (বনলতা সেন) এই শব্দবন্ধের আবেদন ও অভিঘাত অন্য কোনো ভাষায় অনূদিত হওয়া, এবং একইরকম আবেদন ও অভিঘাতে প্রকাশ করা এক প্রকার অসম্ভব। অনুবাদে কবিতার বক্তব্য অটুট রাখা গেলেও, কখনো সমস্যার কারণ হয়ে ওঠে উপমা এবং অনুষঙ্গের ব্যবহারকে অক্ষুন্ন রাখা। আল মাহমুদের 'নাড়ার অবিরাম দহন' (কবিতা এমন) কি অনুবাদে স্পষ্ট করা সম্ভব ? সম্ভব কি 'লক্ষ্মীর পাঁচালী'-র জার্মানি অনুবাদ ? আমার এক হিন্দিভাষী কবিবন্ধু একটি বাংলা কবিতার হিন্দি অনুবাদ করতে গিয়ে 'সতীপীঠ' শব্দটির মানে জানতে চেয়েছিল। বলেছিলাম, কিন্তু আমার সেই বন্ধু অনুবাদে শেষমেশ সেই কবিতার নির্বাচনকেই বাতিল করে দিয়েছিল।

সব কবিতাকেই translated form এ লেখা যায় নিশ্চয়ই। শেষ অব্দি সেটি ভাষান্তরিত একটি লেখা হয়ও বটে, কিন্তু তা সর্বদা কবিতা হয়ে ওঠে না। কবিতার অনুবাদ করতে গেলে অনূদিত subject টি তর্জমাকৃত ভাষায় কবিতা হল কী না সেদিকে নজর রাখাও তাই একজন অনুবাদকের অবশ্যকর্তব্য। সেকারণেই কবিতার অনুবাদ করতে গেলে অনুবাদককে কবি অথবা কবিতার সমঝদার হওয়া অত্যন্ত জরুরি। একটি সনেটের অনুবাদকে অবশ্যই সনেট হতে হবে। ত্রিওলে কিংবা লিমেরিক -- অনূদিত হয়ে নিখুঁত ত্রিওলে বা লিমেরিক ফর্মে পরিবেশনই একজন অনুবাদকের কাজ। একইভাবে পংক্তি-প্রান্তিক মিল সমন্বিত কোনো কবিতার অনুবাদেও সেই মিলকে বজায় রেখেই অনুবাদ করা দরকার। অন্যথায় কবিতার মাধ্যমে কবিকৃত সৃষ্টিপ্রয়াসটিকে অস্বীকার করা হয় এবং সেক্ষেত্রে অনুবাদকর্মটি চূড়ান্ত ভাবে ব্যর্থ বলেই গণ্য হবে। এই সমস্ত

বাধা অতিক্রম করে এবং যাবতীয় শর্তকে মান্যতা দিয়ে একটি যথার্থ অনুবাদ তাই যথেষ্ট শ্রমসাধ্য একটি রচনা। ফলে সব কবিতাও অনুবাদযোগ্য হয় না।

আবার, কোনো একটি কবিতা যখন অনুবাদের অনুবাদ হয়, স্বাভাবিকভাবেই সেই অনূদিত কবিতাটি মূল থেকে বেশ খানিকটা সরে আসতে চায়। অনুবাদের অনুবাদ বলতে আমি বোঝাতে চাইছি, একটি কবিতা যেকোনো ভাষা থেকে প্রথমে ইংরেজিতে এবং পরে সেই ইংরেজি অনুবাদ থেকে আর এক অন্য ভাষায় অনূদিত হবার কথা। একটি কবিতার অনুবাদ করে অনূদিত লেখাটিকেও সেই ভাষার কবিতা করে তুলতে অনুবাদককে সাহায্য নিতে হয় ভাবের। ভাবানুবাদটি মূল কবিতার যত কাছাকাছি হয়, অনুবাদকের দক্ষতাও স্বীকৃত হয় ততই।

বক্তব্যটিকে স্পষ্ট করতে একটু উদাহরণ দেওয়া যাক। যেমন, শেক্সপিয়ারের সনেটের অনুবাদ অনেক কবিই করেছেন। এখানে একটি সনেটের মূল এবং সেই সঙ্গে বিভিন্ন জন কবিকৃত অনুবাদ নিচে দেওয়া হল। একই কবিতা, অনূদিত হয়েছে একই ভাষায়ও। এর মধ্যে কোনটি ভালো, কোনটি তত-ভালো-নয়, তা দেখার জন্য নয়, দেওয়া হল অনুবাদের স্বার্থে কে কতটুকু স্বাধীনতা নিয়েছেন, তা লক্ষ্য করার জন্য

মূল কবিতা :

Sonnet 18 / William Shakespeare

Shall I compare thee to a summer's day ?
Thou art more lovely and more temperate :
Rough winds do shake the darling buds of May,
And summer's lease hath all too short a date;
Sometime too hot the eye of heaven shines,
And often is his gold complexion dimm'd ;
And every fair from fair sometime declines,
By chance or nature's changing course untrimm'd;
But thy eternal summer shall not fade,
Nor lose possession of that fair thou owest;
Nor shall death brag thou wander'st in his shade,
When in eternal lines to time thou grow'st;
So long as men can breathe, or eyes can see,
So long lives this and this gives life to thee.

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের অনুবাদ :

বসন্ত দিনের সনে করিব কি তোমার তুলনা ?
তুমি আরও কমনীয়, আরও স্নিগ্ধ, নম্র, সুকুমার :
কালবৈশাখীতে টুটে মাধবের বিকচ কল্পনা,
ঋতুরাজ ক্ষীণপ্রাণ, অপ্রতিষ্ঠ যৌবরাজ্য তার ;
অলোকের বিলোচন কখনও বা জ্বলে রুদ্র তাপে,
কখনও সন্নত বাষ্পে হিরন্ময় অতিশয় ম্লান ;
প্রাকৃত বিকারে, কিংবা নিয়তির গূঢ় অভিশাপে,
অসংবৃত অধঃপাতে সুন্দরের অমোঘ প্রস্থান।
তোমার মাধুরী কিন্তু কোনও কালে হবে না নিঃশেষ :
অজর ফাল্গুনী তুমি, অনবদ্য রূপের আশ্রয় ;
মানে না প্রগতি তব মরণের প্রগলভ নির্দেশ,
অমৃতের অধিকারী যেহেতু এ-পঙক্তিকতিপয়।
মানুষ নিঃশ্বাস নেবে, চোখ মেলে তাকাবে যাবৎ,
আমার কাব্যের সঙ্গে তুমি রবে জীবিত তাবৎ।

বিষ্ণু দে-র অনুবাদ :

তোমার উপমা আমি দেব নাকি বসন্তের দিনে ?
তুমি আরো রমনীয়, হিম-উষ্ণে আরো যে সুষম।
চৈতালির রূঢ় বায়ু হানা দেয় মাধবীবিপিনে,
বৈশাখের চুক্তিপত্রে দিনের মৌরুসী বড় কম,
থেকে থেকে আকাশের চোখ জ্বলে মহাপরাক্রমে,
এবং সুন্দর সবই সৌন্দর্য খোয়ায় কালক্রমে
দৈবে কিংবা প্রকৃতির রূপান্তরে রূপসজ্জাহীন,
আবার কখনো দেখি স্বর্ণবর্ণ ভয়ার্ত মলিন।
অথচ তোমার নিত্য বসন্তের নেই ক্ষয়রোগ,
তোমার রূপের স্বত্ব হাতছাড়া হয় না ভূলোকে,
মৃত্যুর ছায়ায় তুমি মৃত্যুর এ দম্ভের সুযোগ
হবে না সেদিনও, যবে কালোত্তর হবে নিত্যশ্লোকে;
যতদিন মানুষের প্রাণ আছে, আছে দু'নয়ান,
ততদিন আয়ু এর, এ তোমাকে করে প্রাণদান।

মণীন্দ্র রায়ের অনুবাদ :

তোমার উপমা আমি দেব কি সে বসন্তের দিনে ?
তুমি যে সুন্দর আরো, তুমি আরো স্নিগ্ধ-কমনীয়।

বৈশাখী হাওয়ায় যতো মঞ্জুল মঞ্জরী ঝরে তৃণে,
বসন্তের সে দখল অস্থায়ী মেয়াদে স্মরণীয়।
কখনো বা মহাতেজে নভশ্চক্ষু সূর্যের প্রতাপ
কখনো সুবর্ণ কান্তি রূপ তার ঢাকে মেঘদলে,
প্রতিটি সৌন্দর্যে জেনো সুন্দরের ঘটে অপলাপ,
হোক সে হঠাৎ, কিম্বা, প্রকৃতির পদ্ধতি বদলে
কিন্তু তব বসন্ত যে চিরন্তন লাবণ্যে ভাস্বর,
হারাবে না কোনোদিন ও-সৌন্দর্য যা আছে তোমার
মৃত্যুরও বড়াই ভাঙে, পাবে না সে ছায়ার ভিতর,
যখন চিরন্তন কাব্যে বেড়ে ওঠে তব সারাৎসার।
যতোদিন এ সংসারে মানুষেরা বাঁচে, দেখে চোখে,
ততোদিন এ কবিতা, ততোদিনই তুমি তার শ্লোকে।

জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর অনুবাদ :

তোমার তুলনা সে কি বসন্তের সমুজ্জ্বল দিন ?
তোমার মাধুর্য আর মৃদুলতা তাকেও হারায়।
ঝড়ের পুরুষ হাতে কুঁড়িদের অস্তিত্ব সঙিন,
কদিন যেতে না যেতে বসন্তের মেয়াদ ফুরায়।
কখনো কখনো দেখি আকাশের দৃষ্টি ভয়ঙ্কর,
প্রায়শ দেখেছি তার সোনারঙ পাণ্ডুর, ফ্যাকাশে।
যা কিছু সুন্দর তাও চিরকাল থাকে না সুন্দর,
বিশ্বনিয়মের বশে, দৈবচক্রে, ম্লান হয়ে আসে।
অনন্ত বসন্ত নিয়ে তুমি কিন্তু বিবর্ণ হবে না,
যে রূপ এখন ধরো, তাই রবে নিত্য সহচর,
যমের ছায়ায় আছো হেন বাক্য যমেও কবে না,
যতো দিন যাবে ততো কবিতায় তুমি অনশ্বর।
যতোকাল মানুষের চলা-ফেরা নিঃশ্বাস প্রশ্বাস
যতোকাল এ কবিতা, সে তোমার আয়ুর আশ্বাস।

সত্যপ্রিয় মুখোপাধ্যায়ের অনুবাদ :

বসন্ত কালের সঙ্গে তুলনা কি চলে গো তোমার ?
তুমি আরও রমনীয়, আরও বেশি অবিক্লব তুমি :
বসন্তের ফুলও ঝরে, বারংবার করে চুরমার
ঝড় তাকে -- ক্ষণস্থায়ী তারও এই যৌবনের ভূমি।
কখনো প্রখর সূর্য ঢেলে দেয় দারুন আগুন,
অপূর্ব কাঞ্চনকান্তি জ্বলে যায় তীব্র অভিমানে ;

সুন্দর মাত্রই ম্লান ক্রমে ক্রমে -- কালের কানুন,
প্রকৃতির পারিপাট্য ক্ষয়ে যায় -- অর্বাচীনও জানে;
অথচ তোমার রূপ অনশ্বর, হবে না মলিন,
তোমার বসন্ত ঋতু পাকাপোক্ত, শাশ্বত ও স্থির।
করাল মৃত্যুও মৃত, পরাভূত সমাপ্তির দিন,
এ অমর পংক্তি হেতু -- তুমি পাবে মৃত্যুঞ্জয়ী নীড়।
যতোদিন প্রাণ আছে, যতোদিন আছে নারী-নর,
ততোদিন তুমিও সত্য, ততোদিন তুমিও অমর।

অনুবাদ প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করার যে, অনুবাদের ভূমিকা শিল্প সংস্কৃতির অন্য ক্ষেত্রে তত গুরুত্বপূর্ণ না হলেও, সাহিত্যের ক্ষেত্রে তা প্রায় অনস্বীকার্য। ফিল্ম বা নাটকে শিল্পীর শরীরী ভাষা, দৃশ্য-দর্শনের অনুভূতি পৃথিবীব্যাপী একই, অর্থাৎ সর্বজনীন ; সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও তেমনই সুর-তাল-লয়। কিন্তু কবিতা ? রসাস্বাদনে যেখানে অনুবাদই বিকল্প হিসেবে অদ্বিতীয়। আর সে কারণেই সম্ভবত অমিতাভ বচ্চনের অভিনয়ের সঙ্গে যত পরিচিত বাঙালি, তত পরিচিত নন তাঁর পিতা কবি হরিবংশ রাই বচ্চনের কবিতা বা গীত-এর সঙ্গে।

এত ভাষার বৈচিত্র্য এই ভারতবর্ষে, না-জানা সে সব ভাষার কবিতার আস্বাদনেও তো অনুবাদেরই অনিবার্য ভূমিকা। তবু কী আশ্চর্যজনক ভাবে আমরা, বাঙালি পাঠকেরা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে আছি। আমাদের আছেন রবি ঠাকুর, আমাদের আছেন কাজী নজরুল -- এই অহংবোধে আমরা বন্ধ করে রেখেছি ঘরেরই লাগোয়া সবকটি জানালা। আন্তর্জাতিক সাহিত্যে আমরা আগ্রহ দেখাই, অথচ প্রতিবেশী সাহিত্যের দিকে ফিরেও তাকাই না। এই স্বেচ্ছা-উদাসীনতার কারণেই আমরা জানতেও পারি না -- কী আর কেমন লেখালেখি হচ্ছে হিন্দিতে, ওড়িয়ায়, অসমীয়ায়। জানতে পারি না এ সময়ে ব্যতিক্রমী ভাবনায় তামিল ভাষায় কবিতা লিখছেন কোন কবি। কেমনই বা হচ্ছে গুজরাতি, মারাঠি কিংবা তেলুগুতে কাব্যচর্চা ! তেলুগু ভাষার কবি ভারভারা রাও-কে জেনেছি অন্য কারণে। মুক্ত কণ্ঠস্বরের বিরুদ্ধে স্বৈরাচারী শাসকের দমন প্রসঙ্গে জেনেছি কবি ভারভারা রাও-এর নাম। জেনেছি বছরের পর বছর জামিন মঞ্জুর না করে প্রবীণ অসুস্থ এই কবিকে জেলে ভরে রাখার কথা। পর্যাপ্ত অনুবাদের অভাবে জানতে পারিনি তাঁর কবিতাকে।

আমরা ইংরেজিতে বিক্রম শেঠ পড়ি, চেতন ভগত পড়ি, অমিতাভ ঘোষ পড়ি অথচ পড়তে চাইলেও কন্নড় অথবা মালয়ালম ভাষার লেখা পড়তে পাওয়ার সুযোগটি তেমন সহজলভ্য নয়। নয়, কেননা সে সব ভাষার বাংলা অনুবাদ হয়ই না প্রায়।

সেই আশির দশকের গোড়ায় কবি শঙ্খ ঘোষ তাঁর 'ঐতিহ্যের বিস্তার' প্রবন্ধে লিখেছিলেন, 'দেশের এক অঞ্চলের সাংস্কৃতিক অবস্থান নিয়ে অন্য অঞ্চলের কোনো সজীব কৌতূহল'-এর কথা, যা 'মনের সৌন্দর্যময় এক স্বাস্থ্য।' তারও আগে, এই নির্লিপ্তির দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন কবি অমিয় চক্রবর্তী, 'আমাদের সবচেয়ে বড়ো দূরত্ব আধুনিক নানা প্রদেশীয় প্রকর্ষ সম্বন্ধে আমাদের নিরুৎসক মন।' উপায়ও বাতলেছিলেন, 'বাংলা সাহিত্যকে বিচিত্র প্রতিষ্ঠিত প্রাণবন্ত করবার একটি উপায় তাকে সমসাময়িক ভারতীয় মৃত্তিকায় সংশ্লিষ্ট করা।'

আলোচনার শুরুতেই মার্কিন কবি লুইস গ্লাক এবং তাঁর কবিতার প্রসঙ্গ এনেছিলাম। এনেছিলাম এ সংশয় থেকেই -- তবে কি অন্যান্য পণ্যের মত বাঙালি পাঠকের কাছে সাহিত্যেরও দেশি অপেক্ষা বিদেশির প্রতি ঝোঁক সহজাত ! প্রতিবেশী সাহিত্যের প্রতি অবজ্ঞা আর আন্তর্জাতিক সাহিত্যের প্রতি এই আগ্রহ প্রসঙ্গেই প্রশ্ন তুলেছিলেন কবি শঙ্খ ঘোষ, 'বিশ্বপট যতখানি, আমাদের সাহিত্যের সামনে ভারতীয় পট কি ততোটা উন্মোচিত ? না কি আমরা সংকীর্ণ এক আত্মতৃপ্তির গন্ডির মধ্যে নিজেদের বেঁধে রাখতে পেরেই খুশি ?' সংশয় ছিল তাঁরও, 'অনুবাদের অভাবেই উদাসীনতা, না কি উদাসীনতার ফলেই অনুবাদের অভাব ?'

বাংলা সাহিত্যে অনুবাদ ও প্রাসঙ্গিক বিষয়াবলী

মাজহার জীবন

১

সাধারণভাবে এবং স্বাভাবিকভাবে ধরে নেয়া হয় বাংলাদেশে অনুবাদ সাহিত্যের পঠন-পাঠন খুবই কম এবং তার ফলে আমরা বিশ্বসাহিত্যের রসাস্বাদন থেকে বঞ্চিত আমরা হচ্ছি। আবার উল্টোদিকে এও বলা হয়, আমাদের দেশের সাহিত্য অন্য ভাষায় অনূদিত হয়ে অন্য ভাষা-ভাষীদের কাছে পৌঁছাচ্ছে না। ফলে যথাযথ পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে এমনকি ব্যক্তিগত উদ্যোগের অভাবে বাংলা সাহিত্যের জ্ঞানভাণ্ডারের রসাস্বাদন থেকে বঞ্চিত হচ্ছে অন্য ভাষার সাহিত্য অনুরাগীরা। তবে এই দুই ধারণার মধ্যে দ্বিতীয় ধারণাটি যথার্থতা অনেক বেশি। বিদেশী ভাষা (মূলত ইউরোপীয় বা গ্লোবাল নর্থের আধিপত্যবাদী রাষ্ট্রগুলোর ভাষা থেকেই) থেকে যদিও বাংলা ভাষায় কিছু কিছু অনুবাদ এখন হচ্ছে কিন্তু বাংলা সাহিত্যের অনুবাদ বিদেশী ভাষায় খুবই কম হচ্ছে, যা হচ্ছে তা একেবারে হাতেগোনা এবং ইংরেজিসহ মাত্র কয়েকটি ভাষায়। এই উপলব্ধি থেকে বলা যায় দেশের সাহিত্যাঙ্গনে অনুবাদ চর্চার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব রয়েছে।

আমরা এ প্রবন্ধে বাংলা সাহিত্যের অনুবাদের অবস্থান দেখার চেষ্টা করবো তবে তা গবেষকের দৃষ্টিতে নয় বরং তা হবে একজন সাধারণ পাঠকের দৃষ্টিতে। আলোচনাতে অনুবাদের পাশাপাশি প্রাসঙ্গিক-অপ্রাসঙ্গিক কিছু বিষয়ও স্বাভাবিকভাবে চলে আসবে।

বাংলাভাষী মানুষকে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজনেই অন্য ভাষার মানুষের সাথে যোগাযোগ করতে হয়েছে সেই আদিকাল থেকে। আর এই যোগাযোগের একটা বড় উপায় হলো অন্য ভাষা রপ্ত করা বা অন্য ভাষা বুঝতে পারা। এ অঞ্চলের মানুষের নানা কারণেই ভারতীয় উপমহাদেশের নানা অঞ্চলসহ উপমহাদেশের গণ্ডি পেরিয়ে সিল্করুট ধরে এগোতে হয়েছে সুদূর ইউরোপ পর্যন্ত। ফলে তারা নানা জাতির শিক্ষা-সংস্কৃতি-রাজনীতি-অর্থনীতির সাথে পরিচিত হয়েছে আর সাথে করে নিয়ে এসেছে সেসব দেশের সংস্কৃতি সাহিত্য ইত্যাদি। উল্টোদিকে বিদেশী শাসকরা এ অঞ্চল আক্রমণ করেছে বারবার। হিউয়েন সাঙ, ইবনে বতুতা প্রমুখ বিদেশী পর্যটকদের বর্ণনায়ও আমরা এ অঞ্চলের কথা জানতে পারি। আবার উল্টোদিকে বাংলাদেশ তথা ভারতীয় উপমহাদেশ আর্য থেকে শুরু করে মুঘল এবং অন্যান্য শাসকগোষ্ঠীর দ্বারা শাসিত হওয়ার কারণে অন্য ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি এ অঞ্চলের মানুষকে জানতে হয়েছে, শিখতে হয়েছে, বুঝতে হয়েছে। ফলে বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও তার সংস্কৃতি একরৈখিক না থেকে বরং তা নানা ধরনের মিথস্ক্রিয়ায় ইতিহাসের বাঁক ধরে নতুন নতুন রূপ পরিগ্রহ করেছে - বিদেশী নানা কিছু গ্রহণ বর্জনের নিরন্তর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। নিজ ভাষায় বিদেশী সাহিত্যকে গ্রহণ করার অন্যতম সহজ উপায় দেশের সংস্কৃতির

সাথে সাজ্জুয্য রেখে তা অনুবাদ করা।

এটা ধরে নেয়া হয়, বাংলা ভাষা সংস্কৃত ভাষা থেকে এসেছে। সংস্কৃত ভাষাকে আর্য ভাষা আর বাংলা ভাষা যাকে দেশি ভাষা, গৌড়ীয় ভাষা বা লৌকিক ভাষা ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয় তা মূলত এই এলাকার মানুষের মুখের ভাষা যা অবশ্যই অনেক আগেই আর্য ভাষার সাথে যোগসুত্র হারিয়ে ফেলেছে। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন, ‘‘বাঙ্লা দেশে সংস্কৃত যে আদি সাহিত্যিক ভাষা ছিল না, তাহার পূর্বে - জনসাধারণের কথিত, সহজবোধ্য প্রাকৃতভাষা সাহিত্যমর্যাদাসম্পন্ন ছিল ও চিরস্থায়িত্বের উদ্দেশ্যে উৎকীর্ণ শিলালিপিতে ব্যবহৃত হইত তাহার প্রাচীনতম নির্দশন মহাস্থানগড় লিপিতে বর্তমান। ইহার সম্ভাব্যকাল খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী। এই প্রাচীন যুগে সংস্কৃতের মহিমা বাঙালী সাহিত্যচেতনায় ও চর্চায় কোন রোখাপাত করে নাই। তাহার প্রায় সাত শতাব্দী পরেই সংস্কৃতের আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত দেখিতে পায়। যদিও কোল বা মুণ্ডা গোষ্ঠী, দ্রাবিড়ীয় ও তিব্বত-ব্রহ্মণ-গোষ্ঠীর সহিত বিমিশ্র অবস্থায় খ্রীষ্টপূর্ব ১০ম-৯ম শতকে আর্য দিগ্বিজয়কারী ও উপনিবেশস্থাপনকারীদের দ্বারা আর্য ভাষা প্রথম বাংলাদেশে আসে। ’’ পণ্ডিতদের মতে, আর্য ভাষার ইন্দো-ইরানীয় অংশের প্রাচীন ভারতীয় আর্য থেকে কথ্য রূপ যা প্রাচ্যের অংশ এবং প্রাচ্য থেকে মাগধী প্রাকৃত, মাগধী প্রাকৃত থেকে অপভ্রংশ এবং অপভ্রংশের পূর্বরূপ যেটাকে প্রাথমিক অবস্থায় বঙ্গ অসমীয়া বলা হয় এবং এর একটি অংশ হল বাংলা ভাষা। এখানে দেখা যাচ্ছে প্রাচীন আর্য ভাষা অনেক আগেই দুটো ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছিল। একটি কথ্য রূপ এবং আরেকটি সাহিত্যরূপ বা বৈদিক ভাষা যেটিকে আমরা বলতে পারি সংস্কৃত ভাষা (সংস্কৃত ভাষা কখনই কথ্যভাষা ছিল না)। তাহলে সংস্কৃত ভাষার সাথে এই কথ্যরূপ ভাষার বিচ্ছেদ ঘটেছে অনেক আগেই। হয়তো এক ধরনের উৎপত্তিগত কারণে একটা যোগসূত্র রয়েছে কিন্তু বাংলা সংস্কৃত ভাষা থেকে উৎপত্তি এটি বলাটা খুব একটা যুক্তিযুক্ত না বলেই মনে হয়।

২

চর্যাপদের (অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী) যে নিদর্শন আমরা পেয়েছি তাকে বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন হিসেবে ধরা হয়। আমরা জানি চর্যাপদে তান্ত্রিকদের যোগ সাধনার কথা বলা হয়েছে যা নেপালের রাজধানীতে পাওয়া গিয়েছে। মহাকাব্য গিলগামেশ, ইংরেজি সাহিত্যে চসার কিংবা স্পেন্সারের কবিতা বর্তমান সময়ের সাধারণ পাঠকের বোঝার জন্য যেমন আধুনিক ইংরেজিতে রূপান্তরের প্রয়োজন পড়ে, তেমনি চর্যাপদ বাঙ্গালী সাধারণ পাঠকের বোঝার জন্য প্রয়োজন পড়ে আধুনিক বাংলায় তার রূপান্তর। কারণ এগুলো যে সময়ে রচিত হয়েছিল তারপর বাংলা ভাষার নানা পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের কারণে চর্যাপদের ভাষার সাথে এখনকার সময়ের ভাষার মিল খুব কম। আমরা এখন দেখব চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ের ঢেণ্ঢনাপাদানাম লিখিত চর্যাপদের ৩৩ নম্বর পদটির চার লাইন বিভিন্ন অনুবাদক

কিভাবে রূপান্তর করেছেন। মূল পদ এরকম:

টালত মোর ঘর নাহি পড়বেসী।

হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশি।।

বেঙ্গসঁ সাপ চড়িল জাই।

দুহিল দুধু কি বেন্টে সামাই।।

ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর রূপান্তর এভাবে:

নগরে মোর ঘর নাহি পড়শী

হাঁড়িতে ভাত নাই নিত্য পরিবেশন করা হয়

বেঙ্গের দ্বারা সাপ আক্রান্ত হয়

দোহা দুধ কি বাটে সামায়

সুব্রত অগাস্টিন গোমেজ রূপান্তর করেছেন এভাবে:

টোলায় আমার ঘর, প্রতিবেশি নাই;

অন্নহীন, নাই তবু ইস্টির কামাই!

ব্যাঙ কি কামড় মারে সাপের শরীরে?

অথবা দোয়ানো দুধ বাঁটে কি যায় ফিরে

ফলে দেখা যাচ্ছে যে, বাংলা ভাষার চর্যাপদ অনুবাদের ক্ষেত্রে শুধু শব্দগত পার্থক্যই নয় বরং অর্থের পার্থক্য আমরা দেখতে পাচ্ছি এক একটি অনুবাদে।

এবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গীতাঞ্জলির একটি কবিতার উদাহরণ দিয়ে দেখবো এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় অনূদিত হওয়ার পর মূল কবিতার থেকে কতখানি পার্থক্য তৈরি হতে পারে। রবীন্দ্রনাথ গীতাঞ্জলি অনুবাদ করেছেন Song Offering নামে। কেউ যদি Song Offering এর বাংলা করতে চায় তাহলে অনুবাদ হিসেবে গীতাঞ্জলি নাও আসতে পারে। অন্যদিকে গীতাঞ্জলি শব্দটার মধ্যে যে বাংলা তথা ভারতীয় ঐতিহ্য এবং মিথের মিথস্ক্রিয়া রয়েছে তা কিন্তু Song Offering এর মধ্যে পাওয়া যায় না। গীতাঞ্জলির 'আমারে তুমি অশেষ করেছ' এই কবিতাটির এক ছত্র আমরা প্রথমে বাংলায় এবং পরে রবীন্দ্রনাথকৃত

ইংরেজি অনুবাদ দেখব। আপনারা যদি রবীন্দ্রনাথকৃত ইংরেজি থেকে বাংলা অনুবাদ করতে চান তাহলে দেখবেন মূল বাংলা থেকে ইংরেজির কতখানি দূরত্ব তৈরি হতে পারে এবং উল্টোদিকে ইংরেজি থেকে বাংলা করতে গেলে তাও কতখানি পরিবর্তন হতে পারে।

আমারে তুমি অশেষ করেছ, এমনি লীলা তব-

ফুরায়ে ফেলে আবার ভরেছ জীবন নব নব।।

Thou hast made me endless, such is thy pleasure,

this frail vessel thou emptiest again and again,

and fillest it ever with fresh life.

প্রিয় পাঠক এবার যদি আপনারা এই ইংরেজি অনুবাদ থেকে বাংলাতে অনুবাদ করতে চান তাহলে দেখা যাবে কোনভাবেই এই দুই লাইনের সাথে বাংলায় মূল কবিতার সাথে মিলানো যাচ্ছে না।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করতে চাই, বাংলা সাহিত্যের এমন কিছু কবিতা এবং রচনা রয়েছে যেগুলো এখনকার সময়ের পাঠকদের জন্য আধুনিক ভাষায় রূপান্তরের প্রয়োজন হতে পারে। উদাহরণ হিসাবে কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের বিখ্যাত ‘জাতিস্মর’কবিতার প্রথম চার লাইন এরকম:

নাথু-সংকটে হাঁকে তিব্বতী হাওয়া।

প্রাকৃত তিমিরে মগ্ন চুমলহরি।

ছঙ্গু-সায়রে কার বহিত্র বাওয়া

অপর্ণ বনে দিয়েছে রহস ভরি। ।

৩

অনুবাদ নিয়ে সাহিত্যসমাজে নানা ধরনের তত্ত্ব রয়েছে। এখানে কোনটির ব্যাখ্যা না করে কয়েকটি শুধু উল্লেখ করা হলো। Translation শব্দটি এসেছে গ্রীক translatio থেকে যার অর্থ to carry across বা to bring across যা সোজা কথায় এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় প্রকাশ করা। ওয়াল্টার বেঞ্জামিন মনে করেন, অনুবাদ হচ্ছে ‘প্রকাশভঙ্গি বা ‘প্রকাশশৈলী। তিনি বলেন, অনুবাদের মধ্য

দিয়ে মূলের প্রতিধ্বনিকে যে ভাষায় ধরবার চেষ্টা সে ভাষার উপর প্রকাশিতব্য উদ্দেশ্যের প্রভাবকে শনাক্ত করাই অনুবাদকের দায়িত্ব। Etienne Dolet ১৫৪০ সালে তার La Maniere de Bien Traduire d'une Langue en Aultre এ অনুবাদকের তিনটি অবশ্যম্ভাবী বৈশিষ্টের কথা উল্লেখ করেন যা আজও প্রাসঙ্গিক - comprehend perfectly the source language বা উৎসভাষা সম্পর্কে পর্যাপ্ত ধারণা, comprehend perfectly the target language বা অনূদিত ভাষা সম্পর্কে সম্যক ধারণা এবং knowledgeable in the subject matter বা বিষয় সম্পর্কে অনুবাদকের জ্ঞান থাকা। জন ড্রাইডেনের অনুবাদ তত্ত্বটি খুব বিখ্যাত - তিনি অনুবাদকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন metaphrase বা আক্ষরিক অনুবাদ, paraphrase বা ভাবানুবাদ, এবং imitation বা অনুকরণ। রোমান জ্যাকবসন তার অন লিঙ্গুয়িস্টিক আসপেক্টস অব ট্রানস্লেশন প্রবন্ধে অনুবাদকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করেছেন: intralingual অর্থাৎ একই ভাষার ভেতর নতুন শব্দ বা প্যারাফ্রেজ, interlingual বা এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় অনুবাদ এবং intersemiotic চিহ্ন বা সংকেত অন্য চিহ্ন বা সংকেতে প্রকাশ। আবার Andre Alphons Lefebvre অনুবাদকে ৭টি ধারায় বিভক্ত করেছেন Phonemic বা ধ্বনিসাম্যমূলক, Literal বা আক্ষরিক, Metrical বা ছান্দসিক, Prose বা গদ্য অনুবাদ, Rhymed বা মিত্রাক্ষর অনুবাদ, Blank Verse বা মুক্ত ছন্দ অনুবাদ এবং Interpretation বা ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ। ইউজিন এ নিডা সাহিত্যের অনুবাদে লক্ষ্য ভাষার প্রকৃতির অনুসন্ধান, অভীষ্ট লক্ষ্য ঠিক করা এবং অনূদিত ভাষার পাঠকদের অনুধাবন ক্ষমতার বিষয়টি অনুবাদের সময় একজন অনুবাদকের মাথায় রাখার কথা বলেছেন।

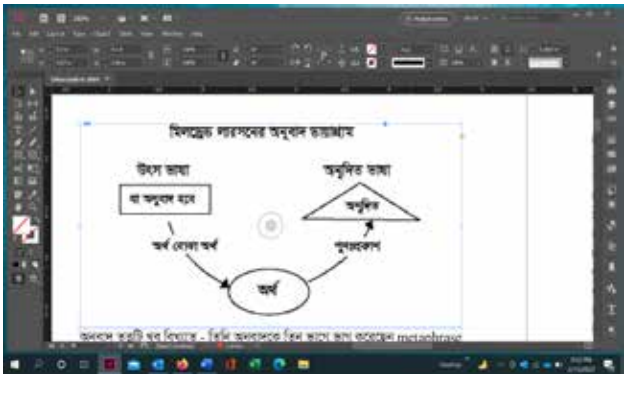

৪

আমাদের দেশে ভাষার লিখিত রূপের প্রাচীনতম নিদর্শন প্রতিলিপি ও ভূমিদানপত্রে পাওয়া যায়। যেমন বগুড়ায় প্রাপ্য শিলাচক্রলিপি প্রাকৃত ভাষায় লেখা। আর গুপ্তযুগের আটদশখানা ভূমিদানপত্র (তাম্রশাসন) পাওয়া গেছে। বঙ্গ

শব্দজাত বঙ্গাল শব্দটির উপস্থিতি টের পাওয়া যায় একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দী হতে। ভারতীয় পর্তুগিজরা বেঙ্গালা (Bengala) আর ইংরেজরা বলেছে বাঙালী ভাষা। অষ্টাদশ শতাব্দীর আগে বাংলা নামে কোন ভাষা ছিল না। এটা আমাদের মনে রাখতে হবে, মূলত দুটো ভাষার নাম জানতো শিক্ষিত সমাজ - পান্ডিত্যের ভাষা সংস্কৃত আর অন্যটি হলো দেশি লৌকিক বা প্রাকৃত ভাষা। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে একে বলা হতো গৌড়ীয় ভাষা। তাই আমরা রামমোহন রায়ের ব্যাকরণের নাম দেখি গৌড়ীয় বাংলা ব্যাকরণ।

প্রাচীন যুগ থেকে আধুনিক যুগের আগ পর্যন্ত লিখিত বাংলা সাহিত্যে যেসব নিদর্শন পাওয়া যায় তার অধিকাংশ ধর্মীয় বিষয়বস্তু। আর এইসব ধর্মীয় বিষয়াবলী তুলে ধরতে গিয়ে কবি-সাহিত্যিকরা সমাজজীবনের প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন কখনো কখনো। এ কথা বলা যেতে পারে যে, ধর্মীয় বিষয় আশ্রয় করে বেশিরভাগ রচনা হয়েছে সংস্কৃত ভাষায়। এখানে উল্লেখ্য, সংস্কৃত ভাষার কাব্যনাটকের চর্চা ছিল মূলত রাজসভায় এবং রাজা ও সামন্ত শ্রেণির জন্য। সংস্কৃত ভাষার লিখিত কাব্য এবং নাটকে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের উপযোগীতা এবং অভিগম্যতাও ছিল না। অনেক বাঙালি পণ্ডিতও সংস্কৃত ভাষায় রচনা করেছেন ধর্মতত্ত্বের পুস্তক। বৌদ্ধ ধর্মের আগমনের পর বৌদ্ধ ভিক্ষুরা সংস্কৃতের চেয়ে প্রাকৃত বা সাধারণ মানুষের মৌখিক ভাষায় তাদের ধর্মতত্ত্ব লেখা ও প্রচারের চেষ্টা করেছেন। ফলে চর্যাপদের ভাষা হয়ে উঠেছে প্রাকৃত বা বাংলা। ফলে দেখা যাচ্ছে যে, বাংলা ভাষাভাষী মানুষের জন্য বাংলা ভাষাকেন্দ্রীক সাহিত্য রচিত হয় তা মূলত রাজন্যবর্গ বা এদেশে সংস্কৃতের প-তিদের হাতে নয় বরং তা সাধারণ মানুষের হাতেই রচিত হয়েছে এবং সাধারণ মানুষের মাঝেই তার চর্চা হয়েছে ব্যাপকভাবে।

ভারতবর্ষে মুসলমান শাসকদের আগমনের ফলে ধীরে ধীরে রাজভাষা হিসেবে ফার্সি ভাষা স্থান করে নেয় এবং তা অব্যাহত ছিল ইংরেজ শাসন পাকাপোক্ত করার আগ পর্যন্ত। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক 'ইংরেজি শিক্ষা আইন ১৮৩৫ প্রবর্তন এর আগ পর্যন্ত দীর্ঘ ৬৩৫ বছর উপমহাদেশের রাজভাষা ছিল ফারসি। ফলে ওই দীর্ঘ সময় ধরে দলিল-দস্তাবেজ থেকে শুরু করে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাবলীর একটা বড় অংশ লেখা হয়েছিল ফারসি ভাষায়। আর সেকারণেই রাজা রামমোহন রায়কেও পুস্তক লিখতে হয়েছিল ফার্সিতে। আর ইংরেজ আগমনে ফারসি জায়গা দখল করে নেয় ইংরেজি। রাজভাষা হয়ে পড়ে ইংরেজি। ভাষার রাজনীতিতে আবার ভারতীয় উপমহাদেশের স্থানীয় ভাষাগুলো মার খায় আধিপত্যবাদী ইংরেজি ভাষার কাছে। ব্রিটিশ আমলে বাংলায় শিক্ষার শুরুটা ছিল অনুবাদের হাত ধরে। উপনিবেশকালের অনুবাদ ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুই অর্থেই বাংলা ও উপনিবেশের প্রয়োজনে শাসিত জাতিগঠনে অলক্ষ্যে এবং বাংলা ভাষা-সাহিত্যের সমৃদ্ধিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

ইংরেজরা ভারতবর্ষ দখলের পর ভাষা ও শিক্ষাকে ইউরোসেন্ট্রিক করার উদ্যোগ নেয়। যার অন্যতম একটি বিষয় হল, ইংরেজিকে লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্যোগ। উপনিবেশ স্থাপনের সাথে রাজনৈতিক অর্থনীতির পাশাপাশি ভাষা ও সাহিত্যের রাজনীতিও গুরুত্বপূর্ণ। ফলে বাংলা ও অন্যান্য ভার্নাকুলার ভাষাকে পরাস্ত করে উপনিবেশিকের ভাষা ইংরেজিকে সেক্ষেত্রে তারা প্রতিস্থাপন করে, চাপিয়ে দেয় এবং তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করে।

বাংলা সাহিত্যে ১২০০ থেকে ১৪৫০ সাল পর্যন্ত সময়কে কেউ কেউ অন্ধকার যুগ বলে থাকেন। কারণ এ কালপর্বে লিখিত সাহিত্যের অস্তিত্ব পাওয়া যায় কম। বলা হয়ে থাকে এ সময় মুসলমান শাসকদের অত্যাচারে সাহিত্যচর্চা করা সম্ভব হয়নি। সুকুমার সেন, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূদেব চৌধুরী প্রমুখ মুসলমানদের আগমনে বাঙ্গলার সমাজব্যবস্থা ধ্বসে পড়ার কথা বলে এ সময়কালীন সাহিত্য রচনায় বাধা সৃষ্টি হয়েছিল বলে যে যুক্তি তারা দেখিয়েছেন তার বস্তুনিষ্ঠ প্রমাণ তারা দেখাতে পারেননি। ১২০০ সালের আগে যে সাহিত্য নিদর্শন মোটা দাগে আমরা দেখি তা হলো চর্যাপদ তাও তা কালের করালগ্রাস থেকে বিলুপ্তির হাত থেকে একে বাঁচিয়েছে নেপালের রাজদরবার। অথচ আমরা দেখি তথাকথিত এই অন্ধকার যুগেই রচিত হয়েছে গিয়াস উদ্দীন আজম শাহের আমলে (১৩৮৯-১৪১০) শাহ মুহাম্মদ সগীরের ইউসুফ-জোলেখা, জালাল উদ্দীন মুহাম্মদ শাহের (১৪১৮-৩১) আমলে কৃত্তিবাসের রামায়ণ আর রুকনউদ্দীন বরবক শাহের আমলে মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্য। আর রামাই পণ্ডিতের শুন্যপুরাণ, হলায়ুধ মিশ্রের সেক শুভোদয়া, বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যও রচিত হয় এ কালপর্বেই। চট্টগ্রামের আলাউদ্দীন হোসেন শাহের (১৪৯৩-১৫১৮) আমলে মহাভারত প্রথম বাংলায় অনুবাদ করেন কবীন্দ্র পরমেশ্বর এবং তাকে এ কাজে উৎসাহ যোগান সুলতান হোসেন শাহের সেনাপতি পরাগল শাহ যা পরাগলী মহাভারত নামে পরিচিত। আবার ভাগবতের বারোটি খণ্ড ও ৬২ হাজার শ্লোকের বাংলা অনুবাদ করছেন মালাধর বসু বা গুণরাজ খান। এরও পৃষ্ঠপোষক বাদশাহ রুকনউদ্দিন বরবক শাহ। আবার এই সময়ই অনুবাদ হয়েছে ফেরদৌসির শাহনামার যা অনুবাদ করেন মোজাম্মেল হক। সে কারণেই হয়তো দীনেশ চন্দ্র সেন মনে করেন, "মুসলমান কর্তৃক বঙ্গবিজয়ই বঙ্গভাষার সৌভাগ্যের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল"। ক্ষিতিমোহন সেন, যদুনাথ সরকার, স্টুয়ার্ট, মুহাম্মদ এনামুল হক প্রমুখ দীনেশ চন্দ্র সেন যেভাবে মনে করেছেন তেমনটিই তাদের আলোচনায় ব্যাখ্যা করেছেন। এখানে লক্ষণীয় যে, চর্যাপদ এর মাত্র কিছু পদ ছাড়া প্রাচীন যুগ থেকে ১২০০ সাল অব্দি অন্য কোন লিখিত সাহিত্যের অস্তিত্বই আপেক্ষিক অর্থে কম। ফলে কোন একটা কালপর্বে লিখিত রূপ কম পাওয়া গেলেই তাকে অন্ধকার যুগ বলে আখ্যা দিতে হবে এটা মারাত্মক দরবারী আধুনিক আগ্রাসী মনোভাবের প্রকাশ। যেকোন ভাষা ও জনগোষ্ঠীর জীবনযাপনের সাথে তার সংস্কৃতি, সাহিত্য ও আচার-আচরণ অবশ্যম্ভাবী হিসেবে

চলমান থাকে ফলে সে তার জীবনযাপনের মাধ্যমেই তার সংস্কৃতির প্রকাশ ঘটায় এবং তা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে ধারণ করে ও বিকশিত হয়। অন্ধকার যুগের কথা বলে আমরা যদি মনে করি যে, এই সময়ে এই বঙ্গে কোন সাহিত্যচর্চা বা সংস্কৃতি চর্চা ছিল না - বিষয়টি একেবারেই ঠিক না। বরং সে সময় তখনকার মানুষের প্রয়োজনে এবং তাদের জীবনের অংশ হিসেবে অবশ্যই সাহিত্য ছিল, সংস্কৃতি চর্চা ছিল যার অন্যতম একটি বড় মাধ্যম হয়তোবা লোকায়ত সঙ্গীত কিংবা পালাগান। মূল বিষয় হলো আমরা এতটা সময়পর্বকে যদি অন্ধকার যুগ বলি তাহলে ওই যুগে বসবাসকারী মানুষদেরকে অপমান করা হয় যা আজকের তথাকথিত 'আধুনিক সমাজের উন্ন্যাসিক মানুষের মানসিকতারই বহিঃপ্রকাশ।

দীনেশচন্দ্র সেন মনে করেন, "আমাদের বাঙ্গালা ভাষাকে পূর্বে লেখাপড়া জানা লোকেরা গ্রাহ্য করিতেন না; তারা ছিলেন মস্ত বড় সংস্কৃতের পণ্ডিত, তারা রাজসভায় টীকি নাড়িয়া বড় বড় সংস্কৃত শ্লোক আওড়াইতেন।" এই তার এ বক্তব্যে বোঝা যায় যে, বাংলা সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ্য এবং রাজরাজাদের ভূমিকা সব সময় কম ছিল বরং এই দুই গোষ্ঠীর প্রতিরোধই ছিল বেশি। কারণ বাংলা ভাষাকে অত্যন্ত নিচু মানের ভাষা এবং বাংলা ভাষা যে পণ্ডিতদের ভাষা না - সংস্কৃত ভাষাই হচ্ছে সাহিত্যচর্চার একমাত্র ভাষা - এই বিষয়টি রাজন্যবর্গ থেকে শুরু করে পণ্ডিতরা মনে করতেন। এখানে আবার বলি যেটা দীনেশচন্দ্র সেন বলছেন, "বাঙ্গালা ভাষায় তখন কেউ বই লিখিলে রাজসভায় তারা আদর হওয়া দূরের কথা - পণ্ডিতেরা তাহা ঘৃণা করিতেন। বাঙ্গালা ভাষা ছিল তখন ইতরের ভাষা - তাহার স্থান ছিল পাড়াগাঁয়ে ছোটলোকদের মধ্যে এবং মেয়েদের মহলে।" ফলে দেখা যাচ্ছে, বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের ভূমিকা অর্থাৎ অন্ত্যজ মানুষের ভূমিকাই বেশি। এখানে পণ্ডিতবর্গের ভূমিকা নাই বললেই চলে বরং বলা যেতে পারে তাদের ভূমিকা ছিল নেতিবাচক।

বাংলা ভাষার উদ্ভবের প্রথম দিক থেকে শুরু করে দীর্ঘ সময় ধরে সংস্কৃত ছিল রাজদরবারের সাহিত্যের ভাষা অর্থাৎ রাজা-মহারাজারা সংস্কৃত জানতেন এবং তারা মনে করতেন যে, জ্ঞানচর্চা শুধু সংস্কৃতির দ্বারাই সম্ভব অন্য কোন ভাষায় নয়। এর ফলে যেটা হতো প-তিরা শুধু সংস্কৃত ভাষা চর্চা করতেন এবং তারা রাজদরবারে কদর পেতেন। আর এই সময়কালীন আমরা দেখি চর্যাপদ বাদে বাংলা সাহিত্যের উপস্থিতি অনেকদিন ধরে আমরা যাকে অন্ধকার যুগ বলছি সেই সময়টাতে লিখিত রূপের সাহিত্য কম পাওয়ার অন্যতম কারণ বাংলা ভাষা কখনোই রাজদরবারের আনুকূল্য পায়নি, ফলে তা সংরক্ষণও হয়নি। ফলে ওই রাজদরবারের সংরক্ষিত সাহিত্য এবং অন্যান্য পুঁথিতে বাংলা ভাষার উপস্থিতি পাওয়া যায় না বরং বাঙালি অর্থাৎ এই অঞ্চলের প-তি ব্যক্তিরাও প্রায় প্রত্যেকেই সংস্কৃত ভাষায় সাহিত্য রচনা করেছেন যার মধ্যে অন্যতম জয়দেব।

আমরা দেখছি বাংলা ভাষায় যখন সাহিত্য চর্চা শুরু হয় প্রথম দিকে এর

সংস্কৃতায়ন হয় যার অন্যতম ব্যক্তিত্ব হলেন চন্ডীদাস নিজেই। এই সময়কালীন যত সাহিত্য রচিত হয় তার ভিতরে সংস্কৃত শব্দের উপস্থিতি আমরা বেশি লক্ষ্য করি। এখানে একটি বাংলা অনুবাদের উল্লেখ করছি যাতে বোঝা যাবে যে, দেবনাগরী হরফে লিখলে এটিকে হয়তো আমরা সংস্কৃত ভাষার কোন কবিতা হিসেবেই মনে করতাম। সেটি এরকম:

জয় শিবেশ শঙ্কর, বৃষধ্বজেশ্বর

মৃদঙ্গ শেখর দিগম্বর

জয় শ্মশান নাটক বিষাণ-বাদক

হুতাশ ভালক মহত্তর।

১৩০০ সালের দিকে মুসলমানদের কাছে বাংলাদেশের একটি বড় অংশ হস্তগত হয়। তারা ইরান তুরান প্রভৃতি বহুদূর থেকে এসেছিল এবং বাংলাদেশে বসবাস করার কারণে এ দেশটি তাদের দেশ হয়ে যায়। তাদের কাছে রামায়ণ, মহাভারত সংস্কৃত ভাষায় লেখা হওয়ার কারণে অপরিচিত হিসেবে থেকে যায়। এই মুসলিম শাসকরা বাংলা ভাষায় এই সমস্ত শাস্ত্র রচনা দিকে জোর দেয় এবং তারা বোঝার চেষ্টা করে যে, এইসব শাস্ত্রে কি লিখিত হয়েছে। আগে উল্লেখ করা হয়েছে,পণ্ডিতরা দেশি ভাষাকে অপছন্দ করতেন এবং ঘৃণা করতেন। ফলে তারা বাংলা ভাষায় কোনভাবেই প্রথমদিকে অনুবাদ করতে রাজি হননি। কিন্তু মুসলমান শাসকদের চাপে বা পৃষ্ঠপোষকতায় তারা বাধ্য হয়ে বাংলা ভাষায় রামায়ণ, মহাভারত অনুবাদ করতে শুরু করেন। মুসলমানরা তখন বাংলার শাসনকর্তা ফলে দেখা যাচ্ছে যে, বিদ্যাপতি পর্যন্ত এই সমস্ত মুসলমান শাসকের প্রশংসা করেছেন। মুসলমান শাসকদের পাশাপাশি হিন্দু শাসকরাও বাংলা ভাষার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করা শুরু করে। যেমন দেখা যাচ্ছে যে, মুকুন্দরামকে আশ্রয় দেয় মেদিনীপুরের রাজা বাঁকুড়া রায়। কিন্তু মজার ব্যাপার হল অনিচ্ছাসত্ত্বেও যেহেতু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা বাধ্য হয়ে বাংলায় তাদের ধর্মীয় গ্রন্থগুলি অনুবাদ করেন, তাই অধিকাংশতেই দেখা যায় সংস্কৃত শব্দের অতি ব্যবহার। এও দেখা গেছে যে, যারা বাংলায় লিখেছেন তাদের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা সরাসরি লিখেছেন। যেমন ব্রাহ্মণরা লিখেছেন, "যাহারা ১৮ পুরাণ ও রামায়ণের বাঙ্গালা অনুবাদ শ্রবণ করিবেন, তাহারা গোষ্টিশুদ্ধ রৌরব নামক নরকে যাইবেন।"

অপরদিকে যখন মুসলমান শাসক ভারতবর্ষ জয় করে এবং এখানকার শাসকরা হিন্দুদের বদলে মুসলমান শাসক প্রতিস্থাপন হয় তখন থেকে ধীরে ধীরে সংস্কৃতের বিপরীতে ফার্সি শব্দ এবং ফারসি সাহিত্যের চর্চা ও এই দেশে শুরু হয় এবং ওই সময়কালীন এবং তার পরবর্তী কালে যে বাংলা সাহিত্য চর্চা হয়

সেগুলো অনেক ক্ষেত্রেই ফারসি শব্দের ব্যবহার আমরা লক্ষ্য করি।

জয়দেবের গীতগোবিন্দ সংস্কৃত ভাষায় রচিত। জয়দেবকে মনে করা হয় বাঙালি। তিনি দ্বাদশ শতাব্দীর কবি ছিলেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, জয়দেবের গীতগোবিন্দ সংস্কৃতে লিখিত হলেও এটি এমন সহজ ভাষায় লিখিত হয়েছিল যে সাধারণ বাঙ্গালীদের মধ্যেও জয়দেবের গীতগোবিন্দের অনেকগুলো কবিতা বাঙালীরা তাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করতেন।

আগেই বলা হয়েছে, বৌদ্ধ-জৈনরা প্রাকৃত ভাষায় ধর্মতত্ত্ব চর্চা করতে পছন্দ করতেন। তাদের হাত ধরেই কথ্যভাষার (অপভ্রংশের) বিকাশ লাভ করে। অষ্টম শতাব্দীর আগ থেকেই অপভ্রংশ ও অবহঠট উত্তরাপথে সংস্কৃতের প্রতিপক্ষ ভাষা হয়ে দাঁড়ায়। আমাদের দেশে বৌদ্ধরা কচড়া বই ও ছড়া গান লিখেছেন। চতুর্দশ শতাব্দীর দিকে অপভ্রংশ- অবহঠটে প্রাকৃত পৈঙ্গল গ্রন্থটি লিখিত হয়। এর কতগুলো কবিতা বাংলাভাষী কবির। যেমন:

সো মোহ কান্তা

দূর দিগন্তা

পাউস আএ

চেলু দুলাএ

(সে মোর কান্ত (এখন) দূর দিগন্তে। বর্ষা আসিতেছে, আঁচল উড়াইব)

বাংলা লিপির উৎস ব্রাহ্মীলিপি। শ্রীরামপুর মিশন স্থাপন হওয়ার আগ পর্যন্ত নানা পরিবর্তনের মাধ্যমে ব্রাহ্মীলিপির আধুনিক রূপ একটি স্থায়ী অবস্থান তৈরি করতে পেরেছে।

৫

'আরাকান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্যের চর্চা বাংলা সাহিত্যের এক অনন্য সম্পদ। এ রাজসভার কবিরা ধর্মীয় বিষয়ের পাশাপাশি ধর্মনিরপেক্ষ রোমান্টিক প্রণয়কাব্য রচনা করেন। ফলে মুসলমান কবিদের হাতেই বাংলা সাহিত্যে ধর্মনিরপেক্ষ সাহিত্য ধারার উদ্ভব বলা যেতে পারে। অনেক মৌলিক কাব্যের পাশাপাশি এসব কবি নানা কাব্য বাংলায় অনুবাদ করেন। হিন্দি কবি সাধনের মৈনাসাত অবলম্বনে দৌলত কাজী (আনু ১৬০০-১৬৩৮) রচনা করেন সতি ময়না ও লোর চন্দ্রানী যার শেষাংশ সমাপ্ত করেন আলাওল। আলাওল (আনু ১৫৯৭-১৬৭৩) মৌলিক রচনার সাথে সাথে অনেকগুলো কাব্যের অনুবাদ করেন। তার মালিক মুহাম্মদ জায়সীর পদুমাবত এর অনুবাদ পদ্মাবতী, ফারসি কবি নিজামী গঞ্জভীর হপ্তপয়কর ও সেকান্দর নামার অনুবাদ যথাক্রমে সপ্তপয়কর ও সেকেন্দরনামা,

শেখ ইউসুফ গদা দেহলবীর তোহফাতুন নেসায়েহ এর অনুবাদ তোহফা। আব্দুল করীম খোন্দকার ফারসি গ্রন্থের ভাবানুবাদ করেন দুল্লা মজলিস নামে।

দৌলত উজির বাহরাম খান ফারসি কবি জামীর কাব্য অবলম্বনে রচনা করেন লায়লী-মজনু (রচনাকাল আনু ১৫৪৩-৫৩ এর মধ্যে)। গরীবউল্লাহ ফারসি থেকে অনুবাদ করেন জঙ্গনামা। ফারসি হাতেম তাই অনুবাদ করেন সাদতুল্লাহ, সৈয়দ হামজা। হায়াৎ মামুদ সর্বভেদবাণী (১৭৩২) নামে হিতোপদেশের যে অনুবাদ করেছিলেন তা ফারসি গ্রন্থ অবলম্বনে সংস্কৃত থেকে নেয়া নয়। এছাড়া তিনি জঙ্গনামা (১৭৩২), হিতজ্ঞানবাণী ও আম্বিয়া বাণী (১৭৫৭) রচনা করেন। হিন্দুদের মহাভারতে যুদ্ধের কাহিনীতে যে শৌর্যবীর্যের দেখা পাওয়া যায় তেমনি মুসলমান কবিরা কারবালার ঘটনা নিয়ে লেখেন জঙ্গনামা যেখানে তাদের শক্তির প্রকাশ ঘটেছে যার লেখক হায়াৎ মামুদ, নসরুল্লাহ, গরীবুল্লাহ, সৈয়দ হামজা প্রভৃতি। ইউসুফ জুলেখার কাহিনী নিয়ে গরীবুল্লাহ লেখেন ইউসুফ জুলেখা। জৈনুদ্দীন, শেখ চান্দ, সাবিরিদ খান প্রমুখ মোহাম্মদের জীবনী কাব্য রসুলবিজয় লেখেন। শেখ চান্দের রসুলবিজয় কাসাস-উল-আম্বিয়ার ফারসি অনুবাদ। ঢাকার মুন্সি মুহাম্মদ মিরনের বাহার দানেশ মৌলবী এনায়েতুল্লাহর ফারসি রচনা অবলম্বনে লেখা। শাকের মামুদ, সেরাদোতুল্লাহ, ফকির মোহাম্মদ, আবদুল রহমান, মোহাম্মদ এবাদত খাঁ, বক্তিয়ার খাঁ, আব্দুল মজিদ, শাহ বদিউদ্দীন প্রমুখ কবিগণ ইসলামের নানা বিষয় নিয়ে কাব্য রচনা করেন যার অধিকাংশই আরবী-ফারসি গ্রন্থের অনুবাদ বা ভাবানুবাদ এবং তার পাঠক অবশ্যই ছিল মুসলিম ধর্মাবলম্বীরাই।

পশ্চিমবঙ্গে লেখা প্রথম মহাভারত কাহিনী রামচন্দ্র খানের অশ্বমেধপর্ব ও জৈমিনীয় সংহিতার মর্মানুবাদ যা ১৫৩২-৩৩ সালের দিকে রচিত হয়। কামতা কামরূপের রাজা বিশ্বসিংয়ের (১৫২২-৫৪) আমলে পীতাম্বর নারায়ণ ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণ অবলম্বনে ঊষা-অনিরুদ্ধের কাহিনী এবং মহাভারত অবলম্বনে নল-দন্তময়ী উপাখ্যান রচনা করেন যার মূল উৎস সংস্কৃত। শংকরদেব (মৃত্যু ১৫৬৮) রামায়ণ উত্তরকা- এবং ৬-৭ স্কন্ধ ভাগবত-পুরাণ অনুবাদ করেছিলেন। এছাড়া তিনি গরুড়-পুরাণের কৃষ্ণার্জুন অবলম্বনে ভক্তিপ্রদীপ রচনা করেন। শংকরদেবের সরাসরি শিষ্য মহাদেব পুরুষোত্তম দেবের নাম মালিকা (১৫৯৬-৯৭) অনুবাদ করেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজের (মৃত্যু ১৫৮২) চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে নানা ধরনের সংস্কৃত উদ্ধৃতি রয়েছে যার অর্ধেকের মতো ভাগবত থেকে আর অন্যান্য মধ্যে রয়েছে গীতা, কৃষ্ণকর্ণামৃত, ব্রহ্মসংগীত, গীতগোবিন্দ, রামায়ণ, মহাভারত, পাণিনিসূত্র প্রভৃতি। এখানে উল্লেখ্য গ্রন্থটিতে কখনো কখনো হিন্দি ফার্সী শব্দের ব্যবহার রয়েছে। ১৫৬০ অব্দে প্রিয় দাসের লেখা ভক্তিমালের অনুবাদ ভক্তমাল এবং জগন্নাথ দাস ভক্তচরিতামৃত নামে অনুবাদ করেন। রামায়ণের প্রথম নারী অনুবাদক চন্দ্রাবতী (জন্ম ১৫৫০)।

সপ্তদশ শতাব্দী থেকে মুসলমান শাসনের ফলে ব্রজভাষা শিক্ষিত বাঙালির কাছে

পরিচিত ছিল। ফারসি শাসকদের ভাষা হওয়ায় অনেকে ফারসি শিখতে শুরু করে এবং আরবি-ফারসি শব্দ বাংলা ভাষায় অবাধে প্রবেশ করতে থাকে। আর ষোড়শ শতাব্দীতে পর্তুগিজদের ভারতবর্ষে আগমন ঘটে। পর্তুগিজ পাদ্রীদের ধর্মগ্রন্থ অনুবাদের সূত্রে বেশকিছু পর্তুগিজ শব্দ ষোড়শ থেকে সপ্তদশ শতাব্দীতে বাংলা ভাষায় স্থান করে নেয়।

৬

ইংরেজদের শাসন শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত বাংলা ভাষাকে মূলত সংস্কৃত এবং ফার্সি ভাষার সাংঘাতিক রকম নিপীড়নের শিকার হয়েই এগুতে হয়েছে। এর কারণ আগেই বলা হয়েছে, বাংলা ভাষা কখনোই রাজভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পায়নি, দরবারের ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হয়নি। বাঙালী চিরকাল বিদেশী ও বিজাতি শাসিত। সাত শতকের শশাঙ্ক নরেন্দ্র-গুপ্ত এবং পনেরো শতকের যদু-জালালুদ্দিন ছাড়া বাংলার কোন শাসকই বাঙালী ছিলেন না। আহমেদ শরীফ মনে করেন, 'জৈন-বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণের মাধ্যমে বাঙালীরা উত্তর ভারতের আর্য ভাষা, লিপি সংস্কৃতি সমাজ ও নীতি বরণ করে সভ্য হয়ে উঠে।'যখন ইংরেজি সাহিত্য চর্চা শুরু হয় অর্থাৎ ইংরেজি যখন আমাদের দেশে শাসন এবং উপনিবেশিক শাসন নিয়ে গেড়ে বসে সে সময় থেকেই ইংরেজি সাহিত্যের চর্চা শুরু হয় অর্থাৎ ইউরোপীয় ভাষার ব্যবহার বাংলাদেশের মানুষের সামনে চলে আসে। ইংরেজ শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর সত্যিকার অর্থে প্রথম এবং ব্যাপকভাবে ইউরোপীয় সাহিত্য বাংলা সাহিত্যের সাথে মিশ্রণের সুযোগ পায়। অবশ্য এখানে উল্লেখ্য শ্রীরামপুর প্রেস এর মাধ্যমে বা শ্রীরামপুর গোষ্ঠীর মাধ্যমে পর্তুগীজদের এখানে একটা বড় ভূমিকা ছিল। ফলে বাংলা ভাষার চর্চা অন্ত্যজ শ্রেণি এবং সাধারণ মানুষের যে দৈনন্দিন জীবনে সংস্কৃতির ভাষার ব্যবহার এবং তাদের দৈনন্দিন সাহিত্য সেটাই আসলে বাংলা ভাষার প্রাণ। এখানে একটি গর্বের বিষয় হলো যে বাংলা ভাষা এমন একটি ভাষা বাংলা সাহিত্যে এমন একটি সাহিত্য আসলে বাংলাদেশের বা এলাকার মানুষের অন্ত্যজ মানুষ আমরা তাদেরকে বলি সেই মানুষের সাহিত্য এবং এই সাহিত্যের বিকাশ হয়েছে এই অন্ত্যজ মানুষদের হাত ধরে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর আগে গীতগোবিন্দ বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়নি। রামানন্দ রায়ের জগন্নাথবল্লভ নাটক ষোড়শ শতাব্দীতে পদকর্তা লোচন দাস অনুবাদ করেন আর সপ্তদশ শতাব্দীতে আকিঞ্চন দাস। কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতামৃতে বিল্বমঙ্গল রচিত কর্ণামৃত (কৃষ্ণকর্ণামৃত) কাব্যের অনেকগুলো শ্লোকের ভাবানুবাদ করেছিলেন। আর কাব্যটির মূল ও টীকায় কাব্য আকারে অনুবাদ করেছিলেন যদু নন্দন দাস। কাব্যটির নাম দিয়েছিলেন কৃষ্ণকর্ণামৃত। তার অন্যান্য গ্রন্থ হল রূপ গোস্বামীর বিদগ্ধমাধব নাটক অবলম্বনে দানলীলা-চন্দ্রামৃত এবং দানকেলিকৌমুদী ভাণিকা অবলম্বনে দানলীলাচন্দ্রামৃত এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের গোবিন্দলীলামৃত।

ভগবতের দশটি শ্লোক অবলম্বনে ভ্রমরগীতার একাধিক অনুবাদক যেমন যদুনাথ দাস, রূপনাথ দাস এবং দেবনাথ দাস। রূপনাথ দাস এবং দেবনাথ দাস অষ্টাদশ শতাব্দীর। রূপের হংসদূতের অনুবাদক নরসিংহ দাস এবং নরোত্তম দাস।

সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সিদ্ধান্ত সরস্বতী নারদীয় পুরাণ অনুবাদ করেন। বৈষ্ণব সাহিত্য মুকুন্দ দেবের ভৃঙ্গরতবলী প্রেম দাস আর অমৃতরসাবলী অনুবাদ করেছিলেন মথুরা দাস। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমদিকের কবি কাশীরাম দাস মহাভারত কাহিনী অবলম্বনে ভারত পাঞ্চালী সংহিতা রচনা করেন। কাশীদাসী সংহিতার আরম্ভ সপ্তদশ শতাব্দীতে এবং পরিণতি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে। বেশ কয়েকজন লেখকের রচনা মিলে সংহিতার আদিপর্ব শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে ছাপা হয় ১৮০৩ সালে চার খণ্ডে। এছাড়া নিত্যানন্দ ঘোষও মহাভারতের অনুবাদ করেন যা আকারে ছোট। চাণক্য শ্লোকের অনুবাদও এ সময় পাওয়া গেছে। বিষ্ণুরাম সিদ্ধান্তের দুর্গাসপ্তসতীর অনুবাদ (১৭৭৩ অব্দ)। বিদ্যাপতি গোরক্ষবিজয় নাটকটি সংস্কৃত, প্রাকৃত মৈথিল ও বাংলা ভাষায় পাওয়া যায়।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে পুরাণের অনেক বাংলা অনুবাদ হয়। যেমন দ্বিজ বৈদ্যনাথ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, শিবপুরাণ, রিপুঞ্জয় ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, পদ্মপুরাণ, দ্বিজ রামানন্দ ধর্মপুরাণ, নৃসিংহপুরাণ, বলরাম কুন্ডু পদ্মপুরাণ, পরমানন্দ শর্মা স্কন্দপুরাণ, হরেন্দ্রনারায়ণ স্কন্দপুরাণ, পদ্মপুরাণ এবং মহিনাথ শর্মা মার্কেণ্ডেয় পুরাণ অনুবাদ করেন। এ ধরনের শতাধিক গ্রন্থ বিভিন্ন কবি পুরাণের অংশবিশেষ নিয়ে রচনা করেন। আবার এই শতাব্দীতে গীতগোবিন্দের অনুবাদ করেন গিরিধর দাস, রসময়য় দাস ও দ্বিজ প্রাণ কৃষ্ণ। রূপগোস্বামীর ললিতমাধবের অনুবাদ করেন স্বরূপচরণ গোস্বামী প্রেমকদম্ব নামে যার রচনাকাল ১৭৮৭-৮৮। তার পূর্বে যদুনন্দন রসকদম্ব নামে বিদগ্ধ মাধব নাটক অনুবাদ করেছিলেন। পরান দাস এবং গোপাল দাস রামানন্দ রায়ের জগন্নাথবল্লভ নাটক অনুবাদ করেন। কবিকর্ণপুরের চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের অনুবাদ করেন প্রেমদাস সিদ্ধান্তবাগীশ (চৈতন্যচন্দ্রোদয় কৌমুদী নামে, ১৭১২ অব্দে)। রঘুনাথ গোস্বামীর বিলাপকুসুমাঞ্জলির অনুবাদ করেন রাধাবল্লভ দাস। বৈষ্ণব সাহিত্যের অনুবাদও দেখা যাচ্ছে অষ্টাদশ শতাব্দীতে আরো অনেক কবি করেছেন। কোনো কোনোটার কবির নাম পাওয়া যায়নি তবে কাব্য পাওয়া গেছে।

এখানে একটা বিষয় খেয়াল রাখা দরকার যে, অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর সন্ধিদশকগুলো বাংলা সাহিত্যের রচনাগুলো দু'ভাগ হয়ে যায়। একদিকে আগের পুঁথিতে লেখা ও প্রচারিত, অন্যদিকে ছাপার অক্ষরে প্রকাশের উদ্দেশ্যে সাহিত্যচর্চা। বলাবাহুল্য যত সময় গিয়েছে তত দ্বিতীয় ধারা শক্তিশালী হয়েছে এবং শেষে একসময় প্রথম ধারা বিলুপ্ত হয়েছে। দ্বিজ রামকুমার কর্তৃক ভাগবতের পদ্যানুবাদ শেষ হয় ১৮৩১ সালে। রাজা রামমোহন রায় ভগবদ্গীতার অনুবাদ করেন যা বৈকুণ্ঠনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে ১৮১৯-২০ সালের দিকে

ছাপা হয়েছিল। শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে বাংলা অক্ষরে প্রথম সাহিত্য গ্রন্থ কৃত্তিবাসের রামায়ণ সম্পূর্ণ এবং কাশিরামের মহাভারতের প্রথম পর্ব যা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পাঠ্যপুস্তক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। মদনমোহন তর্কালঙ্কার সুবন্ধু রচিত বাসকদত্তার অনুবাদ করেন ১৮৩৭-৩৮ সালে। কালীপ্রসাদ কবিরাজ বত্রিশ সিংহাসন এবং বেতাল পঞ্চবিংশতি অনুবাদ করেন।

সংস্কৃত সুকসপ্ততি উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে অনুবাদ করেন নন্দকুমার কবিরত্ন সুকবিলাস নামে। দ্বারকানাথ কুন্ডু ফার্সি থেকে গোলবে-সেনুয়ার এবং ইংরেজী থেকে তুর্কির ইতিহাস লেখেন। গোবর্ধন দাস হাতেম তাই, হরিমোহন কর্মকার ইউসুফ জুলেখা এবং আরব্য উপন্যাস মনোহর উপাখ্যান, মহেন্দ্র মিত্র লাইলী-মজনু রচনা করেন। এখানে দেখা যাচ্ছে, মুসলিম সাহিত্যিকদের পাশাপাশি হিন্দু সাহিত্যিকরাও ফারসি আরবী সাহিত্য অনুবাদে উৎসাহী হন।

৭

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক থেকে গদ্য রচনা উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় যদিও গদ্য রচনাকে দৃঢ় ভিত্তি পেতে পরবর্তী চার দশক লেগে যায়। এই সময়েও কালীকৃষ্ণ বাহাদুর Gay's Fable এর অনুবাদ হিত-সংগ্রহ (১৮৩৬) এবং Persian Tales এর গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নীলমণি বসাকের অনুবাদ পারস্য ইতিহাস পদ্যে অনূদিত হয়। উল্লেখ্য পাঠ্যপুস্তকের বাইরে সাহিত্যে গদ্যের অনুবাদের আরম্ভ হয় ১৮৪০ সালের দিকে। একদিকে মহাভারত-রামায়ণ অন্যদিকে হাতেম তাই, সংস্কৃত, উর্দু, ফার্সি থেকে গদ্যানুবাদ এবং রামায়ণ আদিকা- (১৮৫৪), মসনবি, সেকেন্দারনামা প্রভৃতির পদ্যানুবাদ করান বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ মহাতাপচাঁদ।

উনবিংশ শতাব্দীর আগে বাংলা গদ্যের ব্যবহার কেবল পত্রদলিল এবং শিক্ষার প্রয়োজনে ব্যবহৃত হতো। এর আগে মূলত সাহিত্যে কোন গদ্যের ব্যবহার ছিল না বললেই চলে। পর্তুগিজ পাদরী মানোএল-দা-আসসুম্পসাম সংকলিত ১৭৩৪ সালে লিসবন থেকে প্রকাশিত রোমান হরফে লেখা ক্রেপা অর্থ শাস্ত্রের অর্থভেদ প্রথম ছাপার অক্ষরে বাংলা বই। অষ্টাদশ শতাব্দীর অষ্টম দশকে চার্লস উইলকিন্স বাংলা মুদ্রণ উপযোগী বাংলা হরফ নির্মাণ করেন এবং নাথানিয়েল হ্যালহেড ১৭৭৮ সালে ইংরেজিতে লেখা বাংলা ব্যাকরণ মুদ্রণ করেন বোধপ্রকাশং শব্দশাস্ত্রং)। এই বইয়ে উদাহরণ ছাপতে প্রথম বাংলা হরফ ব্যবহৃত হয়েছিল। ১৮০০ সালে শ্রীরামপুর থেকে বাংলায় বাইবেল ছাপা হয়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চার্লস উইলকিনস বাংলা ছাপার অক্ষর তৈরি করেন এবং তা এন বি হেলহেডের বাংলা ব্যাকরণ এর উদাহরণ ও উদ্ধৃতিতে প্রথম ব্যবহার হয় ১৭৭৮ সালে। আর বাংলা হরফের প্রথম সাহিত্যের বই স্যার উইলিয়াম জোন্স সম্পাদিত কালিদাসের ঋতুসংহার (১৭৯২)। উইলিয়াম কেরি (১৭৬১-১৮৩৪), উইলিয়াম

ওয়ার্ড (১৭৬৯-১৮২৩) এবং জোশুয়া মার্শম্যানের সহায়তায় শ্রীরামপুর মিশন প্রেস ১৮০০ সালে স্থাপন করে ঐ বছরেই বাইবেলের মঙ্গলসমাচার মাতিউর প্রকাশ করেন। এদিকে গোলকনাথ শর্মার অনুবাদ বই হিতোপদেশ ১৮০১ সালে প্রকাশিত হয় শ্রীরামপুর প্রেস থেকেই। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে ব্যবহারের জন্য সংস্কৃত অনুবাদ বত্রিশসিংহাসন (১৮০২), রাজাবলি (১৮০৮) এবং হিতোপদেশ (১৮০৮) মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার সংকলন করেন। একই কলেজের অধ্যক্ষ গিলক্রিস্ট এর তত্ত্বাবধানে The Oriental Fabulist (১৮০৩) বাংলায় অনূদিত হয়। হিন্দি থেকে চণ্ডীচরণ মুনশী তোতা ইতিহাস (১৮০৫) এবং বিদ্যাপতির পুরুষপরীক্ষা (১৮১৫) অনুবাদ করেন হরপ্রসাদ রায়। রাজা রামমোহন রায়ের বেদান্তগ্রন্থ এবং বেদান্তসার গ্রন্থ দুটো অনুবাদাত্মক।

অক্ষয় কুমার দত্তের বাহ্য প্রকৃতির সাথে মানব প্রকৃতি সম্বন্ধে বিচার (১৮৫২-৫৩), চারুপাঠ (১৮৫৮-৫৯), এবং ধর্মনীতি (১৮৫৬), ইংরেজি গ্রন্থের অনুবাদ/ভাবানুবাদ। কালি প্রসাদ ঘোষ বাঙ্গালীদের মধ্যে প্রথম ইংরেজিতে কবিতা লিখেছেন। ভারতচন্দ্রের কিছু কবিতা তিনি ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন। আবার কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ইংরেজি ভাষায় প্রথম নাটক লেখেন The Persecuted ((১৮৩১)। এছাড়া শশীচন্দ্র দত্ত (১৮২৪-৮৫) Bangaliana এবং Shankar উপন্যাস ইংরেজিতে প্রকাশ করেন। বিদ্যাসাগরের সহপাঠী মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ (মৃত্যু ১৮৬০) ইংরেজি থেকে অনুবাদ করেন আরব্য উপন্যাস আরবীয়োপাখ্যান (১৮৫৯) এবং তারাশঙ্কর তর্করত্ন (মৃত্যু ১৮৫৮) বাণভট্টের কাব্যের অনুবাদ কাদম্বরী (১৮৫৪) এবং জনসনের রাগেলাস (১৮৫৭) অনুবাদ করেন।

ভার্নাকুলার লিটারেচার সোসাইটি বেথুনের উদ্যোগে ১৮৫১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় যার বাঙালি সদস্য ছিলেন বিদ্যাসাগর, রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রমুখ। এ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে অনেক ইংরেজি পুস্তক বাংলায় অনূদিত হয় যার মধ্যে অন্যতম মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায়কৃত ক্রীফলের নীতিকথা।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম কাব্য হিসেবে স্বীকৃত রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মিনী উপাখ্যানে (১৮৫৮) শেক্সপিয়ার, মূর, স্কট প্রভৃতি ইংরেজি কবির কবিতার স্পষ্ট লক্ষণ পাওয়া যায়। এছাড়া তিনি কালিদাসের কুমারসম্ভব এবং সংস্কৃত কবিতার অনুবাদ সংকলন নীতিকুসুমাঞ্জলি অনুবাদ করেন।

বিলেতি আদলে প্রথম বাংলা নাটকের মঞ্চায়ন হয় কলকাতায় ১৭৯৫ সালের ২৭শে নভেম্বর হেরাসিম লেবেদেভের মাধ্যমে। তিনি M Joddrell এর The Disguise বাংলায় অনুবাদ করেন যা মঞ্চে অভিনীত হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে ইংরেজি নাটকের মাঝে দু এক অঙ্ক বাংলায় অভিনীত হত।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে গুরুদাস হাজরা ১২৫৫ বঙ্গাব্দে শেক্সপিয়ারের রোমিও এবং জুলিএটের মনোহর উপাখ্যান বের করেন। আর হরচন্দ্র ঘোষ ওই বছরই শেক্সপিয়ারের নাটকের নাট্যানুবাদ ভানুমতী-চিত্তবিলাস নাটক যা Merchant of Venice এর গদ্য ও পদ্যে বঙ্গানুবাদ। আর চারুমুখ-চিত্তহরা নাটক (১৮৬৪) রোমিও জুলিয়েটের দেশি সংস্করণ। ফলে দেখা যাচ্ছে ইংরেজ শাসন বাংলায় স্থায়ী আসন লাভ করার পর যাত্রাপালার জায়গায় ধীরে ধীরে কলকাতা নাগরিক সমাজে ইউরোপীয় ধারার নাট্যচর্চা বাড়তে থাকে। যেমন Rowe এর The Fair Penitent এর অনুবাদ নবকামিনী নাটক (১২৬৩ বঙ্গাব্দ) অনুবাদ করেন শ্যামাচরণ দাস দত্ত। শেক্সপিয়ারের Cymberline অবলম্বনে চন্দ্রকালী ঘোষ কুসুমকুমারী (১৮৬৮) অনুবাদ করেন এবং তা মঞ্চস্থ হয়। রামনারায়ণ তর্কালঙ্কার সংস্কৃত থেকে বেণীসংহার (১৮৫৬), রত্নাবলী (১৮৫৮), অভিজ্ঞান শকুন্তলা (১৮৬০) এবং মালতীমাধব (১৮৬৮) অনুবাদ করেন। এই সময়কালীন অসমীয়া নাটকেরও বাংলা অনুবাদ হয়। এই ধারায় সংস্কৃত নাটকেরও অনুবাদ হতে থাকে, যেমন নন্দকুমার রায় অভিজ্ঞান শকুন্তলা (১৮৫৫), কালীপ্রসন্ন সিংহ বিক্রমোর্বশী নাটক (১৮৫৭) অনুবাদ করেন। এছাড়া তিনি ভবভূতির মালতিমাধব ((১৮৫৯), শৌরীন্দ্রনাথ ঠাকুর মালবিকাগ্নিমিত্র (১২৬৩ বঙ্গাব্দ) এবং রামগতি ন্যায়রত্ন চন্দ্রকৌশিক (১৮৬৯) অনুবাদ করেন।

৮

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-৯১) ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ তথাকথিত বাংলার রেঁনেশার অন্যতম প্রতীক। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হওয়ার কারণে তিনি ইংরেজ সরকারের নীতিনির্ধারকদের সাথে সরাসরি কাজ করার সুযোগ পান। ভার্নাকুলার ভাষাকে প্রমিত করতে যেয়ে তিনি সংস্কৃতায়নের দিকে মনোযোগ দেন। ফলে বাংলা ভাষায় এক ধরনের শৃঙ্খলা আসলেও তা সংস্কৃতমুখী হয়ে পড়ে। যাহোক বিদ্যাসাগরের মৌলিক রচনার চেয়ে অনুবাদই বেশি। ইংরেজদের উপনিবেশ প্রকল্পের বিদ্যাসাগর ছিলেন একজন সমন্বয়ক। যেমন "কালেজ অব ফোর্ট উইলিয়ম নামক বিদ্যালয়ে, তত্রত্য ছাত্রগণের পাঠার্থে, বাঙ্গালা ভাষায় হিতোপদেশ নামে যে পুস্তকে নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাহার রচনা অতি কদর্য্য। তৎপরিবর্ত্তে পুস্তকান্তর প্রচলিত করা উচিত ও আবশ্যক বিবেচনা করিয়া, উক্ত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মহামতি শ্রীযুত মেজর জি. টি. মার্শল মহোদয় কোনও নুতন পুস্তক প্রস্তুত করিতে আদেশ দেন। তদনুসারে আমি, বৈতালপচীসী নামক প্রসিদ্ধ হিন্দী পুস্তক অবলম্বন করিয়া, এই গ্রন্থ লিখিয়াছিলাম।" এটি হলো বিদ্যাসাগরের বেতালপঞ্চবিংশতির ভূমিকা ফলে তিনি যে ইংরেজদের আদেশেই পুস্তকটি লিখেছেন তা পরিস্কার। বাংলার ইতিহাস পাঠের মাধ্যমে উপনিবেশায়ন প্রক্রিয়া নিশ্চিত করে তরুণ সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি বদলানো ইংরেজ সমাজের

জন্য খুব প্রয়োজন ছিল যা বিদ্যাসাগরের সুচারুরূপে পালন করতে পেরেছেন। তার অনুবাদ গ্রন্থ হিন্দি থেকে বাংলা: বেতাল পঞ্চবিংশতি (১৮৪৭; লল্লুলাল কৃত বেতাল পচ্চীসী), সংস্কৃত থেকে বাংলা : শকুন্তলা (১৮৫৪ ; কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তলম), সীতার বনবাস (১৮৬০ ; ভবভূতির উত্তর রামচরিত ও বাল্মীকি রামায়ণ-এর উত্তরাকাণ্ড), মহাভারতের উপক্রমণিকা (১৮৬০; ব্যাসদেব মূল মহাভারত-এর উপক্রমণিকা অংশ), বামনাখ্যানম (১৮৭৩ ; মধুসূদন তর্কপঞ্চানন রচিত ১১৭টি শ্লোকের অনুবাদ)। ইংরেজি থেকে বাংলা : বাঙ্গালার ইতিহাস (১৮৪৮; মার্শম্যানকৃত হিসট্রি অফ বেঙ্গল), জীবনচরিত (১৮৪৯; চেম্বার্সের বায়োগ্রাফিজ), নীতিবোধ (প্রথম সাতটি প্রস্তাব-১৮৫১ ; রবার্ট ও উইলিয়াম চেম্বার্সের মরাল ক্লাস বুক), বোধোদয় (১৮৫১; চেম্বার্সের রুডিমেন্টস অফ নলেজ), কথামালা (১৮৫৬; ঈশপস ফেবলস), চরিতাবলী (১৮৫৭; বিভিন্ন ইংরেজি গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকা), ভ্রান্তিবিলাস (১৮৬৯; শেক্সপিয়রের কমেডি অফ এররস)। সম্পাদিত গ্রন্থ: কিরাতারজ্জুনীয়ম (১৮৫৩), সরবদর্শনসংগ্রহ (১৮৫৩-৫৮), কুমারসম্ভবম (১৮৬২), কাদম্বরী (১৮৬২), বাল্মীকি রামায়ণ (১৮৬২), রঘুবংশম (১৮৫৩), মেঘদূতম (১৮৬৯), উত্তরচরিতম (১৮৭২), অভিজ্ঞানশকুন্তলম (১৮৭১), হর্ষচরিতম (১৮৮৩), পদ্যসংগ্রহ প্রথম ভাগ (১৮৮৮; কৃত্তিবাসী রামায়ণ থেকে সংকলিত), পদ্যসংগ্রহ দ্বিতীয় ভাগ (১৮৯০ ; রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রচিত অন্নদামঙ্গল)। বলে রাখি ভ্রান্তিবিলাস তিনি গদ্যে অনুবাদ করেন। তিনি স্থান, পাত্র-পাত্রীর নাম ইংরেজির পরিবর্তে ভারতীয় রাখেন। এখানে খেয়াল করার বিষয় এক্ষেত্রে যে নামগুলো তিনি ব্যবহার করেছেন তা বাংলা ভাষার চেয়ে বরং সংস্কৃতঘেঁষা বেশি।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩) বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শক্তিশালী সাহিত্যিক। তিনি একাধারে মহাকাব্য, নাটক, রম্য নাটক, চতুর্দশপদী কবিতা এবং অমিত্রাক্ষর ছন্দের সফল রূপকার। তার মহাকাব্য মেঘনাদবধের কাহিনী তিনি নিয়েছেন রামায়ণ থেকে যা সংস্কৃত ভাষায় রচিত। এখানে সহজেই অনুমেয় মহাকবি তার এ মৌলিক বা স্বতন্ত্র মহাকাব্যটি রচনায় সংস্কৃত বা অনূদিত বাল্মিকীর রামায়ণের সাহায্য নিয়েছেন। তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের (১৮৬০) আখ্যান তিনি মহাভারতের আদিপর্বের সুন্দর-উপসুন্দর কাহিনী থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছেন। বীরাঙ্গনা কাব্যে পুরাণে বর্ণিত ১১ জন নারীর কাহিনী বর্ণনা করেছেন। আর বলার অপেক্ষা রাখে না, এসব কাহিনী আরোহণ করতে তাকে সংস্কৃতি ভাষার আশ্রয় নিতে হয়েছে। এদিকে তার পদ্মাবতী নাটকটি গ্রিক পুরাণের কাহিনী অবলম্বনে আর কৃষ্ণকুমারী নাটকের উপাদান নিয়েছেন উইলিয়াম টডের রাজস্থান নামক গ্রন্থ থেকে। এছাড়া, তিনি সরাসরি অনুবাদ করেছেন হোমারের কাহিনী হেক্টরবধ। তিনি রত্নাবলী, শর্মিষ্ঠা এবং দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ নাটকের অনুবাদ করেন ইংরেজ দর্শকদের বোঝানোর জন্য। ফলে দেখা যাচ্ছে, মাইকেল মধুসূদন দত্তের সাহিত্যকর্মের সাথে অনুবাদের এক নিবিড় যোগসূত্র রয়েছে।

৯

বাংলা গদ্যরীতি মোটামুটি একটা প্রতিষ্ঠা লাভ করলে উপন্যাস রচনার বিষয়টি সামনে চলে আসে। উপন্যাস রচনার প্রাথমিক একটি ধারা খ্রিস্টান মিশনারীদের লেখা অনুবাদ ও মৌলিক নীতিকথা। এর মধ্যে প্রথম হানা ক্যাথরিন মুলেনসের ফুলমণি ও করুণার বিবরণ (১৮৫২) এবং Missionary's Badgerow এর অনুবাদ পাদরী সাহেবের বাজরা। এ ধারার অনূদিত আখ্যায়িকা Lady of the Lake এর অনুবাদ অপূর্ব কারাবাস (১৮৭১), কান্তি চন্দ্র বিদ্যারতে□র শেক্সপিয়ারের টুয়েলভ নাইট অবলম্বনে সুশীলা-চন্দ্রকেতু (১৮৭২), গালিভারস ট্রাভেলস এর উপেন্দ্রনাথ মিত্র কৃত অনুবাদ অপূর্ব দেশভ্রমণ (১৮৭৬), ডন কুইকসোটের বিপিনবিহারী চক্রবর্তী কৃত অদ্ভুত দ্বিগি□জয় (১৮৮৭), নন্দ লাল দত্ত কৃত ফিল্ডিং এর এমিলিয়ার মন্মথ মনোরমা (১৮৭৭)। এছাড়া রেনল্ডেসের কয়েকটি পুস্তকের অনুবাদ হয় এই সময়ে। এখানে উল্লেখ্য বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সাহিত্যে প্রথম ইংরেজি ধাঁচের উপন্যাস লেখেন। কপালকু-লা, দূর্গেশনন্দিনী, বিষবৃক্ষ এগুলি তার প্রমাণ।

১০

কাব্য অনুবাদে মধুসূদন দত্তের প্রভাবে গিরিশচন্দ্র বসু মিল্টনের মহাকাব্যের সাত সর্গ স্বর্গভ্রষ্টকাব্য (১৮৬৯) এবং ইলিয়ডের প্রথম সর্গ (১৮৩৭) অনুবাদ করেন। টেনিসনের ইনমেমোরিয়ামের অনুবাদ রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় করেন মিত্র বিলাপ (১৮৬৯) নামে। এছাড়া তিনি মেঘদূত (১৮৮২) অনুবাদ করেন। এ সময় গোল্ড স্মিথ, গ্রে, পার্নেল, স্কট, কুপার, মিল্টনের কবিতা অনূদিত হয়। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় শেক্সপিয়ারের টেম্পেস্ট অবলম্বনে নলিনী বসন্ত (১২৭৫ বঙ্গাব্দ) এবং রোমিও জুলিয়েট (১৮৯৫) অনুবাদ করেন।

অক্ষয় চন্দ্র চৌধুরী (১৮৫০-৯৮) পোপের এলোইস টু আবেলার্ড অবলম্বনে মাধবীলতা কাব্য রচনা করেন। রামকৃষ্ণ রায় রামায়ণ (১৮৭৭-৮৫) ও মহাভারত (১৮৬১-৭১) অনুবাদ করেন। এছাড়া তিনি জেমস এর পোয়েমস অব অসিয়ানের অংশত অনুবাদ করেন। হরলাল রায় ভট্ট নারায়ণের বেনিসংহার অবলম্বনে নাটক শত্রুসংহার (১৮৭৪) এবং শেক্সপিয়ারের ম্যাকবেথ অবলম্বনে রুদ্র পাল (১৮৭৪) এবং অভিজ্ঞান শকুন্তলা অবলম্বনে কনকপদ্ম (১৮৭৪) রচনা করেন। বিজয় চন্দ্র মজুমদার (১৮৬১-১৯৪২) গীতগোবিন্দ (১৩২৬ বঙ্গাব্দ) অনুবাদ করেন। যতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইংরেজি থেকে রজতগিরি (১২৮৫ বঙ্গাব্দ) অনুবাদ করেন। তিনি বাংলা ভাষায় ইংরেজি থেকে মার্কাস অরেলিয়াস-এর মেডিটেশনস ও শেক্সপিয়ারের জুলিয়াস সিজার অনুবাদ করেন। মলিয়েরের ল বুর্জোয়া জাঁতিয়ম অবলম্বনে হঠৎ নবাব (১৮৮৪) এবং মারিয়াস ফোর্সে অবলম্বনে দায়ে পড়ে দারগ্রহ (১৩০৯ বঙ্গাব্দ) অনুবাদ করেন। ১৮৯৯ থেকে ১৯০৪ সালের

মধ্যে তিনি সতেরটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কৃত নাটক বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন। এর মধ্যে অভিজ্ঞান শকুন্তল (১৩০৬ বঙ্গাব্দ) ও মালিকাগ্নিমিত্র (১৩০৮ বঙ্গাব্দ), বিক্রমোর্বশী (১৩০৮ বঙ্গাব্দ), ভবভূতির উত্তরচরিত (১৩০৭ বঙ্গাব্দ), মালতী মাধব (১৩০৭ বঙ্গাব্দ) ও সুদ্রকের মৃচ্ছাদিকা প্রভৃতিসহ শ্রীহর্ষ, বিশাখা দত্ত, ভট্ট নারায়ণ কৃষ্ণ মিশ্র এবং কৃষ্ণ কানাইয়ার নাটক অনুবাদের পাশাপাশি তিনি মারাঠা থেকে ঝাঁসির রানী (১৩১০ বঙ্গাব্দ) ও বাল গঙ্গাধর তিলকের গীতারহস্য অনুবাদ করেন।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ আধুনিক যুগে বাংলা নাটকের প্রাণপুরুষ। তিনি অনেক মৌলিক নাটক রচনা করেন। এই মৌলিক নাটকের পাশাপাশি তিনি ইংরেজি সাহিত্যের বিভিন্ন বিখ্যাত নাটক অনুবাদ করেন এবং তা মঞ্চস্থ হয়। যেমন ম্যাকবেথ (১৩০৮ বঙ্গাব্দ) এবং রেনল্ডসের ওয়াগনার দা ওয়ারউলফ অবলম্বনে মুকুল মঞ্জুরা এবং মলিয়েরের নাটক লা আমুর মেঁদিসা অবলম্বনে য্যায়সা কা আসসা (১৩১৩ বঙ্গাব্দ) লেখেন। শেক্সপিয়ারের নাটকের আরো কয়েকটি অনুবাদ প্রমথনাথ বসু অমর সিংহ (১৮৭৪, হ্যামলেট), যোগেন্দ্র নারায়ণ দাস ঘোষের অজয় সিংহ-বিলাসবতী (১৮৭৮, রোমিও-জুলিয়েট), তারকনাথ মুখোপাধ্যায় ম্যাকবেথ (১৮৭৫), অজ্ঞাতনামার মদনমঞ্জুরী (১৮৭৬, এ উইন্টার টেলস), প্যারীলাল মুখোপাধ্যায়ের সুর লতা (১৮৭৭, মার্চেন্ট অফ ভেনিস), চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের প্রকৃতি নাটক (১৮৮০-৮৪, টেমপেস্ট) উল্লেখযোগ্য। ফলে দেখা যাচ্ছে, শেক্সপিয়ার কলকাতার রঙ্গমঞ্চে একটি শক্তিশালী আসন করে নিয়েছিলেন।

এখানে বলে রাখা দরকার যে, এদেশে ব্রিটিশ উপনিবেশ তথা ইংরেজদের শাসন মজবুত হয়েছে, ইংরেজি সাহিত্য বাংলা সাহিত্যে অনুবাদ হয়েছে বা ইংরেজি সাহিত্যের চর্চা বাংলা ভাষা-ভাষীদের মধ্যে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাদের অবস্থান শক্তিশালী হয়েছে এবং তারা পুরোপুরি তাদের উপনিবেশ আমাদের এই অঞ্চলে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে। সেই সময়ে ইংরেজি সাহিত্যচর্চার ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। শ্রীরামপুর প্রেসের দ্বারা কেরির পুত্র ফেলিক্স কেরি এবং মার্শম্যানের পুত্র জন ক্লার্ক মার্শম্যান অনেক ইংরেজি গদ্য ইতিহাস গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ করেন বা করান যা পাঠ্যপুস্তক হিসেবে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত হয়। এর সাথে যুক্ত হন এ দেশীয় ইংরেজি জানা রামকমল সেন, রামগোপাল সেন, রামতনু লাহিড়ী, প্যারীচাঁদ মিত্র, গৌরদাস বসাক প্রমুখ। এরা সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা (১৮৩৮) প্রতিষ্ঠা করেন। এদের দ্বারাই নানাবিধ ইতিহাস, দর্শন এবং জীবনীগ্রন্থ বাংলায় অনূদিত হয়। উপন্যাসের সাথে সাথে অ্যাডভেঞ্চার ও ক্রাইম কাহিনী বাংলা ভাষায় ব্যাপকহারে লেখা শুরু হয় এবং তা জনপ্রিয়তা পায়। মৌলিক রচনার পাশাপাশি অনূদিত হতে থাকে এই অ্যাডভেঞ্চার কাহিনীগুলো। যেমন চণ্ডীচরণ সেন অনুবাদ করেন স্টো-এর টম কাকার কুটীর (প্রথম ভাগ, ১৩৯১ বঙ্গাব্দ) এবং তলস্তয়ের চল্লিশ বৎসর। ফরাসি গোয়েন্দা গল্পকার ভিদক, জ. জবরফ ও রেনল্ডেসের গোয়েন্দা কাহিনী অনূদিত হয় এ সময় কালে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিক থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক থেকে বাংলা সাহিত্যে অনুবাদের ধারা ক্ষীণ হতে থাকে এবং এ সময় কবিতা, নাটক, উপন্যাস, ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে মৌলিক গ্রন্থ লেখার দিকে এদেশের সাহিত্যিকরা মনযোগী হয় বলে মনে হয়। ইতিমধ্যে বাংলা ভাষার ভিত্তিও মজবুত হতে থাকে। অনেকগুলো সংবাদপত্র বাংলা ভাষায় বের হয়। সংবাদপত্র বাংলা লিখিত ভাষাকে প্রাঞ্জল ও গতিশীল হতে ভূমিকা রাখে। এ সময়ের উল্লেখযোগ্য সংবাদপত্র হলো দিগদর্শন (১৮১৮), সমাচার দর্পন (১৮২০), বাহ্মণ সেবধি (১৮২১), সংবাদ প্রভাকর (১৮৩১), রঙ্গপুর বাত্তাবহ (১৮৪৭), গ্রামবার্তা প্রকাশিকা (১৮৬৩)।

প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় গল্প ইংরেজিতে স্টোরিজ অফ বেঙ্গলি লাইফ প্রকাশিত হয় যার অনুবাদক ছিলেন গল্পকার নিজে এবং এমএস নাইট। বিজয় কৃষ্ণ ঘোষ (১৮৮৭-১৯৬১) ওমর খৈয়ামের রোবায়েৎ এবং আর্নল্ডের কবিতার অনুবাদ করেন। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তীর্থ সলিল (১৯০৮), তীর্থ রেণু (১৯১০) এবং মণিমঞ্জুষা (১৯১৫) নামে তিনটি অনুবাদ কবিতার বই প্রকাশ করেন যেখানে অন্তত সাড়ে পাঁচ শত কবিতার অনুবাদ রয়েছে। এখানে বিশ্বসাহিত্যের নানা ভাষার কবিতা অনুবাদ হয়েছে যদিও কবিতাগুলোর অনুবাদ তিনি বেশিরভাগ ইংরেজি থেকে করেছেন। এ ছাড়া তিনি স্টিফেন ফিলিপস, এস্কিলাস, মেটারলিঙ্ক এবং চীনা ও জাপানি নাটকের অনুবাদ করেন যার চারটি রঙ্গমল্লীতে (১৯১৩) স্থান পেয়েছে। তিনি নরওয়ের লেখক ঔড়হধং খরব এর লেখা লিভসস্লাভেন উপন্যাস ইংরেজি থেকে অনুবাদ করেন জনমদুঃখী (১৯১২) নামে।

ভারতী গোষ্ঠীর অন্যতম সদস্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জামাতা মনিলাল গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৮৫-১৯২৯)। তিনি ওলান্দাজ হতে অনুবাদ করেন ভাগ্যচক্র। এছাড়া মনিলাল জাপানি গল্প জাপানি ফানুস (১৯০৯) ও কল্পকথা (১৯০৯) অনুবাদ করেন। অন্য সদস্য শচীন্দ্রনাথ বাগচী ফরাসি থেকে অনুবাদ করেন ফরাসি গল্প (১১৫)। আবার শৌরীন্দ্রমোহন মলিয়েরের নাটক যৎকিঞ্চিত (১৯০৮), তলস্তয়ের মৃত্যু-লোচন এবং মেটারলিঙ্কের রূপসীর নাট্যরূপ দেন। তার অনূদিত উপন্যাস বন্দী (১৯১১, হুগো), মাতৃঋণ (দোদে), অবন্ধনা ও নতুন আলো (গোর্কী), অসাধারণ (তুর্গেনেভ), জনৈকা (মপাশা)। অন্যদিকে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জার্মান লেখক হাউফের গল্প অবলম্বনে লেখেন আগুনের ফুলকি (১৩২১ বঙ্গাব্দ)। তিনি বিদেশী গল্প অবলম্বনে উপন্যাস লেখেন যার মধ্যে যমুনা পুলিনের ভিখারিনী (১৩৩০ বঙ্গাব্দ), চোরকাঁটা (১৩২৬ বঙ্গাব্দ), সর্বনাশের নেশা (১৯২৩), ব্যবধান (১৯৩৬) ইত্যাদি। এছাড়া তিনি হর্থনের স্কারলেট লেটার এর অনুবাদ পঞ্চতিলক (১৯১৯) নামে অনুবাদ করেন। হেমেন্দ্রকুমার রায় (১৮৮৮-১৯৬৩) ওমর খৈয়ামের কবিতা ইংরেজি থেকে অনুবাদ করে প্রকাশ করেন। আবার দেখা যাচ্ছে কয়েকটি ভারতীয় বই ইংরেজি ভাষায় রচিত হয়েছে যেমন রেভারেন্ড লালবিহারী দে

এর Folk Tales of Bengal (১৮৮৩) লন্ডন থেকে প্রকাশিত এবং Govinda Samanta (১৮৭২) পরে Bengal Peasant Life (১৮৭৮) নামে প্রকাশিত হয়। এছাড়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্রী শোভনা দেবীর গ্রন্থ The Orient Pearls (১৯০৫) ইংরেজিতে প্রকাশ করেন। সুধীন্দ্রনাথ ঘোষ ইংরেজিতে উপন্যাস লেখেন যার মধ্যে অন্যতম হলো And Gazelles Leaping (১৯৪৯), Cradle of the Clouds (১৯৫১), The Vermilion Boat (১৯৫৩) এবং Flame of the Forest (১৯৫৫)।

শরৎচন্দ্র বলয়ের ভাগলপুর দলের অন্যতম হলেন ইন্দিরা দেবী (১৮৮৯-১৯২২)। তিনি কোনান ডয়েলের দ্য মিস্ট্রি অফ ক্লুম্বার অবলম্বনে তার প্রথম উপন্যাস সৌধ-রহস্য রচনা করেন। শান্তা দেবী ও সীতাদেবী দুই বোন মিলে শ্রীশচন্দ্র বসুর Tales of Hindoostan এর অনুবাদ হিন্দুস্তানি উপকথা (১৯১২) প্রকাশ করেন। সবুজপত্রের অন্যতম ব্যক্তিত্ব প্রমথ চৌধুরী বা বীরবল ফরাসি গল্পের অনুবাদ ফুলদানি, ইতালি থেকে অনুবাদ সিদ্ধ বোতলের কথোপকথন প্রবন্ধ সবুজপত্র প্রকাশ করেন। কল্লোল ও প্রগতি পত্রিকার যুগে মোহিতলাল মজুমদার একজন শক্তিশালী কবি তিনি মৌলিক কবিতার পাশাপাশি কিছু বিদেশী কবিতা অনুবাদ করেছিলেন। তার কাব্যগ্রন্থ হেমন্ত গোধূলি (১৯৪০) কাব্যের একটি অংশ হলো অনুবাদ কবিতা।

গিরিশ চন্দ্র সেন (১৮৩৪-১৯১০) প্রথম বাংলা ভাষায় পুর্ণাঙ্গ কুরআন (১৮৮০-৮৬) অনুবাদ করেন। এখানে দেখা যাচ্ছে বেদ, রামায়ণ, মহাভারত, বাইবেল বাংলা ভাষায় অনূদিত হলেও কোরানের অনুবাদ হয়েছে অনেক পরে। তিনি শেষ ফরীদুদ্দীন আত্তারের ফারসি ভাষায় রচিত তাযকেরাতুল আওলিয়ার ভাবাদর্শে তাপসমালা (১৮৮০-৯৫), হাদিস-পূর্ব বিভাগ (১৮৯২) শিরোনামে মিশকাত শরীফের প্রায় অর্ধাংশ অনুবাদ করেন। তার তত্ত্বরত্নমালা (১৯০৭) শেখ ফরীদুদ্দীন আত্তারের মানতেকুত্তায়েব ও মওলানা জালালউদ্দীন রুমীর মসনবী শরীফ নামক ফারসি গ্রন্থদ্বয় থেকে সংকলিত। এ ছাড়া তিনি মূল ফারসি থেকে গুলিস্তাঁ ও বুস্তার হিতোপাখ্যানমালা, হাদিস বা মেসকাত্ মসাবিহ (১৮৯২-৯৮), দীউয়ান-ই-হাফিজ প্রভৃতি। তিনি রামমোহন রায়ের তুহ্ফাৎ-উল-মুয়াহ্হিদীনের (১৮৭৮) বঙ্গানুবাদ করেন।

কাজী নজরুল ইসলাম দিওয়ান-ই-হাফিজ, রুবাইয়াৎ ই ওমর খৈয়াম, কাব্যে আমপারা এর অনুবাদ করেন। এখানে উল্লেখ্য আধুনিক কালে অবাঙালি আবু সয়ীদ আইয়ুব মীরের গজল থেকে এবং গালিবের গজল থেকে নামক দুটি অনবদ্য কাব্য বাংলা অনুবাদ করেন। সুরেশ্বর শর্মা শেলী সংগ্রহ (১৯৩৯), ব্রাউনিং এর পঞ্চাশিকা (১৯৩৯) অনুবাদ করেন। কান্তি চন্দ্র ঘোষ (১৮৮৬-১৯৪৮) ফিটজেরাল্ডের ইংরেজি অনুবাদ থেকে ওমর খৈয়াম কবিতা অনুবাদ করেন। আবার নরেন্দ্রনাথ দেব (১৮৮৯-১৯৭১) মেঘদূত এবং ওমর খৈয়ামের

কবিতা অনুবাদ করেন যা সমাদৃত হয়েছিল।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-১৯৬০) টি এস এলিয়ট, হানস্ এগন হোল্টহুজেন, জন ম্যাসফিল্ড, ডি এইচ লরেন্স, হেনরিক হাইনে, গ্যাটে, পল ভেলোরি, শেক্সপিয়ার এবং মালার্মের কবিতার বাংলায় অনুবাদ করেছেন যা তার প্রতিধ্বনি কাব্যে সন্নিবেশিত হয়েছে। অন্যদিকে বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-৭৮) কালিদাসের মেঘদূত, ফরাসি কবি বোদলেয়ার, রুশ কবি বরিস পাস্তরনাক, জর্মন কবি হোলডারলিন এবং রাইনে মারিয়া রিলকে, চীনা কবি লি পো, হান ইউ, পো চু-ই, এবং য়ুয়ান চন এবং মার্কিন কবি এজরা পাউন্ড, ওয়ালেস স্টিফেন্স, ই ই কামিংস, উইলিয়াম কার্লোস উইলিয়ামস্ প্রভৃতি কবিদের কবিতা অনুবাদ করে বিশ্বসাহিত্যের সাথে বিশেষ করে আধুনিক ইউরোপীয় ও আমেরিকান কবিদের সাথে বাঙালী পাঠকের পরিচয় ঘটান।

রুশ বিপ্লব এবং চিনা বিপ্লবের ফলে ওইসব দেশের সাহিত্য বাংলা সাহিত্যে বা বাংলা ভাষায় অনুবাদের সুযোগ সৃষ্টি হয়। এ ক্ষেত্রে উল্লেখ করার মতো হলো চিনা এবং রুশ ভাষা থেকে শুরু করে কোরিয়ান ভাষায়ও আমরা কিছু সাহিত্যের অনুবাদ পাই। রাশিয়ার ক্লাসিক সাহিত্য যেমন তলস্তয়ের যুদ্ধ ও শান্তি, পুনরুজ্জীবন, আনা কারেনিনা, দস্তয়েভস্কির ইডিয়ট, বঞ্চিত লাঞ্ছিত, ক্রাইম এন্ড পানিশমেন্ট, কাজারভ ভাইয়েরা, চেখভের গল্প, মায়াকাভস্কির কবিতা, নিকলাই গোগল, তুর্গেনেভ প্রভৃতির সাহিত্যকর্ম বাংলায় অনুবাদ হয়। ওদিকে চীনের প্রাচীন সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, লু সুনের সাহিত্য, চিনা লোককাহিনী বাংলায় অনূদিত হয়। অপরদিকে কিছু স্প্যানিশ সাহিত্যের অনুবাদ আমরা পরবর্তী কালে পাই। যেমন মার্কেজের গল্প সংগ্রহ ও হান্ড্রেড ইয়ারস অব সলিটিউট এর শতবর্ষের নীরবতা নামে বাংলায় অনূদিত হয়েছে।

অনুবাদের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বাংলাদেশের সেবা প্রকাশনী। উঠতি বয়সী যুব পাঠকদের কথা মাথায় রেখে ফরাসি, ইংরেজি এবং স্প্যানিশ সাহিত্যের বিখ্যাত বই অতি সহজ বাংলায় সাধারণীকরণের মাধ্যমে অনুবাদের কাজটি করে এই প্রকাশনী। ফলে বাংলাদেশের সাধারণ পাঠকের কাছে সাধারণ অর্থে পরিচিতি পায়। সেবা প্রকাশনীর কিশোর ক্লাসিক বাংলাদেশে অনুবাদের একটি নতুন ক্ষেত্র। এই প্রকাশনীর মাধ্যমে শেক্সপিয়ার, আলেকজান্দার দ্যুমা, রবার্ট লুই স্টিভেনসন, চার্লস ডিকেন্স, হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড, এরিক মারিয়া রেমার্ক, হোমার, হার্ডিং, ব্রুন্টি, মার্ক টোয়েন প্রভৃতি সাহিত্যিকের বই বাংলায় সহজ ভাষায় রূপান্তরিত হয় ফলে আমরা দেখি ওয়েদারিং হাইটস, ইলিয়াড, ওডিসি, ডন কুইক্সোট, ডি আর্বারভিল, গ্রেট এক্সপেকটেশন, ডেভিড কপারফিল্ড প্রভৃতি নাটক, উপন্যাস, মহাকাব্য বাংলায় পড়ার সুযোগ তৈরি হয়। এই সমস্ত ক্লাসিকের অনুবাদকদের মধ্যে অন্যতম কাজী আনোয়ার হোসেন, কাজী শাহ নূর হোসেন, শেখ আবদুল হাকিম, সায়েম সোলায়মান চৌধুরী, নিয়াজ মোর্শেদ প্রমূখ।

*১১

আধুনিক যুগে এসে বাংলাদেশে আরব্য রজনী, রুমির শাহনামা প্রভৃতি বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়। শাহনামা বিশাল গ্রন্থটি অনুবাদ করেন মনিরউদ্দীন ইউসুফ (১৯১৯-৮৭)। তার অন্যান্য অনুবাদ হলো ইকবালের কাব্য সঞ্চয়ন, দীওয়ান-ই-গালিব, কালামে রাগিব, রুমীর মসনবী। প্রথমদিককার গুরুত্বপূর্ণ অনুবাদ হলো ফয়েজ আহমেদ ফয়েজ (১৯৭০) অনুবাদ করেন রণেশ দাশগুপ্ত। অতিসম্প্রতি মির্জা গালিব, ফয়েজ আহমেদ ফয়েজ, আহমেদ ফারাজ, সারমাদ শাহীদ, মনসুর হাল্লাজ, আহমেদ ইলিয়াস, রুমির কবিতা উর্দু- ফারসি থেকে অনুবাদ করেছেন জাভেদ হুসেন। মাওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ (১৮৬৯-১৯৬৮) উম্মুল কেতাব, আমপারার তাফসীর এবং কুরআনের বঙ্গানুবাদ তাফসিরুল কোরআন প্রভৃতি অনুবাদ করেন। এস ওয়াজেদ আলী (১৮৬৯-১৯৬৮) গুলদাস্তা লেখেন। ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ বেশকিছু অনুবাদ করেন যার মধ্যে অন্যতম দিওয়ান-ই-হাফিজ, রুবাইয়াৎ-ই-উমর খয়্যাম, শিকওয়াহ ও জবাব-ই-শিকওয়াহ, মহাবাণী, বাইঅতনামা এবং অমিয়বাণী শতক। মোতাহের হোসেন চৌধুরী (১৯০৩-১৯৫৬) সভ্যতা (ক্লাইভ বেলের সিভিলাইজেশন) এবং সুখ (রাসেলের কনকোয়েস্ট অফ হ্যাপিনেস) গ্রন্থের অনুবাদ করেন। ড. মুহম্মদ এনামুল হক (১৯০৬-১৯৮২) অস-সবউল-মু অল্লকাত সম্পাদনা করেন। ড. আহমদ শরীফ সম্পাদনা করেন লায়লী মজনু, তোহফা, সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল, সিকান্দর নামা, আর সৈয়দ আলী আহসান (১৯২২-২০০২) সফোক্লিসের ইডিপাস নাটক এবং মেরিডিথ ও ওয়াল্ট হুইটম্যানের নির্বাচিত কবিতার অনুবাদ আর সম্পাদনা করেন পদ্মাবতী ও মধুমালতী। মোবাশ্বের আলীর (১৯৩১-২০০৫) অনুবাদ এন্টিগোনি। আবুল কালাম শামসুদ্দীন অনাবাদি জমি নামে ইভান তুর্গেনেভ এর ভার্জিন সয়েল উপন্যাসের অনুবাদ করেন এবং তার ঝর্ণাধারা উপন্যাসটি তুর্গেনিভ এর গল্প অবলম্বনে রচিত। ইউজিন ও নীলের লং জার্নি ইনটু নাইট নাটক অমা রজনীর পথে নামে অনুবাদ করেছেন কবির চৌধুরী। আর্থার মিলারের ডেথ অব আ সেলসম্যান অনুবাদ করেছেন ফতেহ লোহানী। ওয়াইল্ডারের দি স্কিন অফ আওয়ার টিথ নাটকটি যন্ত্রণা চাপ নামে অনুবাদ করেন আসকার ইবনে শাইখ। ফ্রস্টের নির্বাচিত কবিতা অনুবাদ করেন শামসুর রাহমান। শওকত ওসমান (১৯১৭-৯৮) অনেকগুলো গ্রন্থ অনুবাদ করেন যার মধ্যে রয়েছে নিশো, লুকনিতশি , বাগদাদের কবি, টাইম মেশিন, পাঁচটি কাহিনী (লিও টলস্টয়), স্পেনের ছোটগল্প , পাঁচটি নাটক (মলিয়ের), ডাক্তার আবদুল্লাহর কারখানা, পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে মানুষ, সন্তানের স্বীকারোক্তি।

গিরিশ কার্নাড ও বিজয় টেন্ডুলকারের নাটক অনূদিত হয়ে ঢাকায় মঞ্চস্থ হয়েছে। আসাদুজ্জামান নূর ব্রেখ্টের দেওয়ান গাজীর কিস্সা ও তারিক আনাম খান মলিয়ঁয়ের-এর কঞ্জুস অনুবাদ করেন। সফোক্লিস, মলিয়ঁরের, হেনরিক ইবসেন,

আলবেয়ার কামু, জাঁ পল সার্ত্রে, বানার্ড শ, এরিয়েল ডর্ফম্যান, আন্তন চেখভ, তৌফিল আল হাকিম প্রমুখের নাটক বাংলাদেশের মঞ্চে হয় অনুবাদে, না হয় রূপান্তর করে মঞ্চস্থ হয়েছে। সৈয়দ শামসুল হকের শেকস্পিয়র অনুবাদ দেশের মঞ্চকে সমৃদ্ধ করেছে। এই নাটকগুলোর মধ্যে ক্রয়লাস ও ক্রেসিদা, ম্যাকবেথ, টেম্পেস্ট, এবং হ্যামলেট উল্লেখযোগ্য। শেকস্পিয়রের নাটকের মুক্ত অনুবাদ করেন মুনীর চৌধুরী। তার অনূদিত মুখরা রমণী বশীকরণ টেলিভিশনে অভিনীত হয়েছে। শেকস্পিয়রের ওথেলো, করিওলেনাস, মার্চেন্ট অব ভেনিস, এ মিড সামার নাইটস ড্রিম, রোমিও জুলিয়েট, জুলিয়াস সিজার-এর রূপান্তর গণনায়ক বাংলাদেশের মঞ্চে অভিনীত হয়েছে।

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের কয়েকটি অনুবাদ গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। খলিকুজ্জামান ইলিয়াস অনুবাদ করেছেন মার্কেজের পেয়ারার সুবাস, সুইফটের গালিভারের ভ্রমণকাহিনী, আকুতাগাওয়া রিউনোসুকের রাসোমন। আব্দুস সেলিম অনুবাদ করেছেন ব্রেক্খটের গ্যালিলিও, হিম্মতি মা, গোলমাথা চোখামাথা, ইবসেনের নাটক লেডি ফ্রম দি সি, হ্যারল্ড পিন্টারের দি বার্থ ডে পার্টি, লুইস ক্যারলের আজব দেশে এলিস। আহমেদ ছফা গ্যাটের ফাউস্ট, হাইকেল হাশমী বাংলাদেশের উর্দু ছোটগল্প, গৌরাঙ্গ হালদার ইরাকি কবি আনোয়ার ঘানির কবিতা, সাগুফতা শারমীন তানিয়া আন্তনিও স্কারমেতোর দ্য পোস্টম্যান, আলম খোরশেদ ভিস্লাভা শিম্বোর্স্কার ত্রিশ কবিতা ও উলফের একটি নিজের কামরা, ফারহানা আজিম নাওয়াল আস-সাদাবির শূন্য বিন্দুতে নারী অনুবাদ করেন। রাজু আলাউদ্দিন ও রফিক-উম-মুনীর চৌধুরী হোর্সে লুইস বোর্হেসের আত্মজীবনী অনুবাদ করেছেন।

এখানে বলে রাখা ভালো বাংলা সাহিত্যে আমরা যেভাবে বাংলাভাষী হিসাবে দরদ দিয়ে প্রয়োজনের তাগিদে শুধু বাংলাই আমাদের কাছে প্রধান ভাষা হয়ে উঠেছে। কিন্তু বাংলা ভাষা ছাড়াও বাংলাদেশে অনেকগুলো ভাষায় অনেক মানুষ কথা বলে যার অন্যতম হলো পাহাড় ও সমতলের বসবাসরত আদিবাসী, দলিত সম্প্রদায় ও চাজনগোষ্ঠীর অনেকগুলো মাতৃভাষা এবং বাংলাদেশের একটি অংশের মাতৃভাষা উর্দু। আমি এই সমস্ত ভাষাভাষী মানুষের কাছে ক্ষমা চাচ্ছি, এই ভাষাগুলো সম্পর্কে আমার এই ছোট আলোচনায় কোন আলোচনা করা হয়নি। তবে একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে আমি এটুকু বলতে পারি বাংলাদেশের এই সমস্ত ভাষাভাষী মানুষের সাহিত্য আমাদের সামনে আসা উচিত। সেগুলো যেমন বাংলায় অনুবাদ পাশাপাশি বাংলা সাহিত্যও তাদের ভাষায় অনুবাদ প্রয়োজন।

১২

ইদানীং অনুবাদ নিয়ে সাহিত্যিকদের মধ্যে আগ্রহ বেড়েছে। ফলে নানা ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ হচ্ছে। এখানে অনুবাদের মান নিয়ে আমি কোন

কথা বলবো না। তবে অনুবাদ হচ্ছে এটা একটা বড় কথা এবং এই অনুবাদগুলো প্রকাশের একটি নতুন জানালা হলো প্রচুর অনলাইন লিটল ম্যাগাজিন। পাশাপাশি প্রিন্টেড ভার্সনেও অনেক অনুবাদ প্রকাশিত হচ্ছে। ফরাসি, আরবি, পর্তুগিজ এবং স্প্যানিশ ভাষা থেকে অনূদিত হচ্ছে ইংরেজির পাশাপাশি। সম্ভবত এই অনুবাদ হওয়ার অন্যতম কারণ লেখকরা অতি সহজেই ইন্টারনেটের মাধ্যমে নানা ধরনের নানা দেশের লেখার সাথে নিজেরা পরিচিত হচ্ছে এবং তাদের সক্ষমতা অনুযায়ী সেগুলিকে অনুবাদ করার চেষ্টা করছে। লক্ষণীয় বিষয় হল অতি সম্প্রতি প্রকাশিত কোন বিখ্যাত বই বাংলা ভাষায় মাসখানেকের ভিতরে অনূদিত হয়ে যাচ্ছে যদিও খুব কম ক্ষেত্রেই লেখক বা প্রকাশকের অনুমতি নিয়ে তা হচ্ছে। এটি একটি ভাল লক্ষণ। আবার ছোটগল্প, কবিতা, আর্টিকেল যেগুলো ইন্টারনেটে পাওয়া যাচ্ছে সেগুলো নানাজন নানাভাবে অনুবাদ করছেন ফলে অনুবাদের পরিমাণ বাংলা সাহিত্যে অনেক বেড়ে গেছে। সামনে এর গুণগত মানের দিকে নজর দিতে হবে।

এখন সময় এসেছে অনুবাদের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক পৃষ্ঠপোষকতা। লেখক সত্বের বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। এ ব্যাপারে পাবলিক-প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়, একাডেমিয়া, ডায়াসপোরা কমিউনিটি, মিডিয়া হাউজ, বিভিন্ন অ্যাম্বাসীর পাশাপাশি প্রয়োজন সরকারি উদ্যোগ যার মাধ্যমে দেশে একটা অনুবাদ সহায়ক পরিবেশ গড়ে উঠবে।

সহায়ক:

* Buddhist Mystic Songs : Dr. Muhammad Shahidullah

* সরল বাঙ্গালা সাহিত্য : দীনেশচন্দ্র সেন

* বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস : সুকুমার সেন

* বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস : মাহবুবুল আলম

* বাঙলা, বাঙালী বাঙলাদেশ : আহমেদ শরীফ

* বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা (প্রথম খ-) : শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

* আরাকান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য: মুহম্মদ এনামুল হক ও আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ

* বিদ্যাসাগর রচনাবলী

* মধুসূদন রচনাবলী

* বিদ্যাসাগর : নির্মাণ-বিনির্মাণ-পুনর্নির্মাণ - দেবোত্তম চক্রবর্তী

* মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস : মওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ

* বাংলা ভাষায় মুসলমানদের অবদান : সম্পাদনা শেখ তোফাজ্জল হোসেন

* সাহিত্যে অনুবাদ ও রূপান্তরের ভূমিকা : আতাউর রহমান

* অনুবাদ সাহিত্য: বৈচিত্র্য ও বৈভব, আদর্শ ও বিতর্ক : আবদুস সেলিম

* বাংলা একাডেমি অনুবাদ পত্রিকা (প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ২০২১)

* প্রবাহ ম্যাগাজিন (লালা, আসাম, বর্ষ ৩৩, সংখ্যা ২, অক্টোবর ২০২০)

অনূদিত গল্প

ভার্জিলিও পিনেরার পাঁচটি গল্প

বাংলা ভাষান্তর: নাহার তৃণা

অনিদ্রা

লোকটা সেদিন বেশ তাড়াতাড়িই শুয়ে পড়ে। কিন্তু ঘুম আসে না। ঘুমের আশায় বার বার এপাশ-ওপাশ করে। তাতে বিছানার দফারফাই সার, ঘুম নাগালের বাইরেই থেকে যায়। লোকটা উঠে একটা সিগারেট ধরায়। বই নিয়ে খানিক পড়বার চেষ্টা করে। নাহ্ মন বসাতে ব্যর্থ হয়। আবার বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়ে। কিন্তু ঘুম তার নাগালের বাইরেই থেকে যায়। রাত যখন তিনটে, তখন সে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে। পাশের ঘরে ঘুমে ডুবে থাকা বন্ধুকে উঠিয়ে নিজের ঘুমহীনতার কথা বলে। বন্ধুর পরামর্শ চায়। বন্ধু পরামর্শ দেয় সে যেন বাইরে গিয়ে খানিক হাঁটাহাঁটি করে আসে। তাতে শরীর ক্লান্ত হবে। এরপর এককাপ লেবু চা খেয়ে বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়লেই হবে; ঘুম আসবে। বন্ধুর কথা মতো পইপই করে সব কাজ করে। কিন্তু তাতেও ঘুম বশ মানে না। আবার সে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে। এবার লোকটা ডাক্তারের কাছে যায়। ডাক্তার যথারীতি একগাদা উপদেশ ঝাড়েন। কিন্তু সেসবও কাজে দেয় না। ভোর ছটার দিকে পিস্তলে গুলি ভরে সে তার কপাল বরাবর চালিয়ে দেয়। লোকটা মারা যায়। মৃত্যু তাকে কোলে টেনে নিলেও ঘুম তার অধরাই থেকে যায়। অনিদ্রা একটা ভয়াবহ অবস্থার নাম।

মূল গল্প: INSOMNIA [1956] by Virgilio Pi-era Translations by Daniel W. Koon

পাহাড়

পাহাড়টা প্রায় তিন হাজার ফুট উঁচু। সিদ্ধান্ত নিয়েছি পাহাড়টাকে একটু একটু করে কামড়ে খেয়ে ফেলবো। পাহাড়টা আর দশটা পাহাড়ের মতোই; গাছপালা, পাথর, মাটি, পশুপ্রাণী, এমনকি মানুষও এর ঢাল বেয়ে ওঠা-নামা করে। প্রতিদিন সকালে আমি পাহাড়টার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ি এবং আমার চলার পথের সামনে যা পাই তা চিবানো শুরু করি। চর্বণের কাজে কয়েক ঘন্টা কেটে যায়। অবসন্ন শরীর আর ফুলে ওঠা চোয়াল নিয়ে আমি বাড়ি ফিরে আসি। অল্প বিশ্রাম নিয়ে এরপর আমি দরজার কাছে বসে দূরের নীল দিগন্তের দিকে ঠায় তাকিয়ে থাকি। আমার কর্মকাণ্ডের কথা যদি প্রতিবেশিকে বলি তবে নিশ্চিত, আমার নির্বুদ্ধিতা নিয়ে হেসে মরবে এবং আমাকে পাগল ঠাওরাবে। নিজের কর্ম বিষয়ে সচেতন বলেই বুঝতে পারছি, দিন দিন পাহাড়টা কেমন উচ্চতা আর ওজন হারাচ্ছে। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে, খুব শিগগিরই হয়ত পাহাড়ের এই ক্ষয়কে ভূতাত্ত্বিক সমস্যা চিহ্নিত করে প্রকৃতিকে দোষারূপ করা শুরু হবে। আর সেটাই আমার জন্য মর্মান্তিক: কেউই একথা স্বীকার করবে না বা জানবে না যে আমিই ছিলাম তিন হাজার ফুট আজদাহা ওই পাহাড়টার ভক্ষক!

মূল গল্প: THE MOUNTAIN [1957] by Virgilio Pi-era Translations by Daniel W. Koon

সাঁতার

আমি সাঁতার শিখেছি ডাঙ্গায়। মনে হয়েছে জলের চেয়ে শুকনো জায়গায় সাঁতার শেখাই শ্রেয়। যেহেতু আপনি ইতোমধ্যে তলদেশে আছেন, ডুবে যাবার কোনো ভয় নেই। একই যুক্তিতে আপনি তো আসলে ইতোমধ্যে ডুবেই গেছেন। কোনোভাবে উজ্জ্বল বাতি কিংবা দিনের আলোর ঝলকানির শিকার হবারও শঙ্কা নেই আপনার। সবচেয়ে বড় কথা শরীরে জল ঢুকে ফুলে যাবার ভয় নেই।

আমি অস্বীকার করছি না যে শুকনো ডাঙ্গায় সাঁতার শেখার দৃশ্যটা মৃত্যুযন্ত্রণার ছটফটানির মতো লাগে। প্রথম দর্শনে কেউ ভাবতে পারে যে আপনি মৃত্যুর সাথে লড়াই করছেন। তবু এটা একেবারেই আলাদা একটা ব্যাপার। একই সাথে আপনি জীবিত আছেন, সতর্ক আছেন, জানালা দিয়ে ভেসে আসা সঙ্গীত সুধা উপভোগ করছেন এবং মাটিতে হামাগুড়ি দেয়া পোকাটিকেও দেখতে

পাচ্ছেন।

প্রথম দিকে আমার বন্ধুরা আমার এই কাজটিতে সায় দেয়নি। তারা আমার দৃষ্টি এড়িয়ে থাকতো এবং আমাকে নিয়ে গোপনে দুঃখ পেতো। ভাগ্যক্রমে সেই সংকট কেটে গেছে। এখন তারা জানে আমি ডাঙ্গায় সাঁতার কাটতেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি। মাঝে মাঝে আমি মার্বেল টাইলসে হাত ডোবাই এবং গভীর তলদেশে আটকে থাকা ছোট ছোট মাছ ধরে বন্ধুদের হাতে দেই।

মূল গল্প: SWIMMING[1957] by Virgilio Pi-era Translations by Daniel W. Koon

পতন

আমরা তিন হাজার ফুট উঁচু একটা পাহাড়ে উঠেছিলাম। পাহাড় চূড়ায় নিজেদের উপস্থিতির কোনো স্বাক্ষর পোঁতার তাগিদে কিংবা কোনো দুঃসাহসী আলপাইন পর্বতারোহীর পতাকা ওড়াতে যাইনি। স্রেফ খেয়ালের বশে যাওয়া। ওখানে কয়েক মিনিট কাটানোর পর আমরা নামতে শুরু করি। আমার সঙ্গীও আমাকে অনুসরণ করে নামতে থাকে। এরকম অবস্থায় যা হয়ে থাকে- আমরা দুজনই একই দড়িতে বাঁধা, দড়িটা আমার কোমরে ঝোলানো আঙটার সাথে যুক্ত। আটান্নব্বই ফুট নামার পর হঠাৎ করে আমার সঙ্গীর পা পাথরে হড়কে যায় এবং সে ভারসাম্য হারিয়ে ডিগবাজী খেয়ে আমার সামনে এসে ঝুলতে থাকে। যেহেতু দড়িটা আমার দুই পায়ের মাঝখান বরাবর আঘাত করেছে এটা আমাকে কঠিনভাবে ঝাঁকুনি দিলো। পাহাড়ের কিনারা থেকে পড়ে যাওয়া ঠেকাতে আমি মোচড়

খেয়ে শরীরটা পেছনের দিকে নিয়ে ভারসাম্য রাখলাম এবং সে ঝুলতে ঝুলতে এসে আমার আগের জায়গাটা দখল করলো। ব্যাপারটা হাস্যকর বা অসম্ভব কিছু নয়। পরিস্থিতি সামাল দিতেই তাকে ওরকমটা করতে হয়েছিল; এটা হলো সেরকম একটা পরিস্থিতি যা এখনো পর্বতারোহীদের ম্যানুয়ালে অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

গতির প্রাথমিক ধাক্কা সামলে নিয়ে সঙ্গী নিজের অবস্থানে কিছুটা সামঞ্জস্য আনতে সক্ষম হয়, কিছু সময় পর দেখতে পেলাম সে আমার দুই পায়ের মাঝ দিয়ে উল্কাবেগে নীচে নেমে গেল, যেহেতু সে আর আমি একই দড়িতে বাঁধা, না চাইলেও আমাকেও সেই ধাবমান গতির সঙ্গে নেমে যেতে হলো, প্রকৃতির রীতি মোতাবেক প্রথমদিকে সে দ্রুত নীচে নেমে গিয়েছিল, কিছুক্ষণ পর তার সেই গতিবেগ বাতাসের ধমকে কমতে থাকে। ফলে আমরা দুজনে মুখোমুখি চলে আসি। এই পরিস্থিতিতে আমরা একটা কথাও বলিনি। দুজনেরই জানা ছিল অচিরেই হুড়মুড়িয়ে আমাদের পতন অবশ্যম্ভাবী। কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পর ঠিকই আমরা নীচের দিকে পড়তে শুরু করলাম। এই পতন ঠেকানোর সাধ্য আমাদের দুজনের কারোই ছিল না। কিন্তু এই অনিবার্য পতনের ভয়াবহতা থেকে নিজের চোখ জোড়া রক্ষার সর্বাত্মক তাগিদে আমি ব্যাকুল হয়ে উঠলাম।

মুখে প্রকাশ না করলেও সঙ্গীটিও যে তার দাড়ির চিন্তায় অস্থির সেটি বুঝতে বাকি থাকলো না। কারণ দাড়ির বিষয়ে সে বরাবরই ভীষণ যত্নশীল- সে চাইবেই তার গথিক গ্লাসের মতো ঝকঝকে ধূসর দাড়িতে বিন্দুমাত্র ময়লাও যেন না লাগে। কাজেই নিজেদের প্রিয় জিনিসের সর্বাত্মক নিরাপত্তার তাগিদে আমার হাত দিয়ে সঙ্গীর দাড়ি, এবং সে তার হাত দিয়ে আমার চোখ রক্ষার প্রাণপণ চেষ্টায় লেগে গেলাম। এদিকে নীচের দিকে আমাদের পতনের মাত্রা ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে। আচমকা সঙ্গীর আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে দেখতে পেলাম একটা ভীষণ ধারালো পাথরের ব্লেড তার মাথার ঠিক ওপরে খাড়া হয়ে আছে। ঠিক তারপরেই আমি দেখে বেকুব হয়ে গেলাম যে আরেকটা ধারালো পাথর আমার পা দুটোকে কোমর থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেললো। এই পাথরটা পাহাড়ের গা থেকে সামুদ্রিক জাহাজ কাটার করাতের মতো এমন ধারালো হয়ে বেরিয়ে এসেছিল যার স্পর্শমাত্র যে কোনো বস্তু কাটা পড়তে বাধ্য।

একজন আরেকজনের দাড়ি আর চোখের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে করতে লক্ষ করলাম প্রতি পঞ্চাশ ফুট বা তারও বেশি অন্তর অন্তর আমাদের একটি করে অঙ্গের হানি ঘটে যাচ্ছে।

উদাহরণস্বরূপ, এরকম পাঁচটি বিরতিতে আমি আর আমার সঙ্গী যা হারালাম তা হচ্ছে: সঙ্গী তার বাঁ-কান, ডান কনুই, একটি পা(কোন পা সেটা মনে নেই), অণ্ডকোষ এবং নাক হারায়; অন্যদিকে আমি হারাই বুকের পাঁজর, মেরুদণ্ড, বাঁ-ভ্রু, বাঁ-কান আর গলার শিরা। কিন্তু এর পরপরই যা ঘটলো সে তুলনায় ওসব অঙ্গহানি কিছুই নয়।

মাটি স্পর্শের আগে সমতল থেকে আমাদের অবস্থান যখন প্রায় এক হাজার ফুট উচ্চতায়, তখন আমার অক্ষত অঙ্গের মধ্যে বাকি ছিল: দুই হাত(শুধুমাত্র কব্জির অংশ), দুই চোখ অন্যদিকে সঙ্গীর অবশিষ্ট ছিল দুই হাত(শুধু মাত্র কব্জি) এবং তার সাধের দাড়ি। দুজনের মনেই একই আশঙ্কা কাজ করছিল যদি পাথরের আঘাতে আমাদের হাত বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়? তখনও আমাদের পতন চলমান। চূড়ান্ত পতনের যখন আর মাত্র ফুট দশেক বাকি, তখন পাহাড়ে কাজ করে যাওয়া কোনো কর্মীর ভুলবশত রেখে যাওয়া পিলারের ধাক্কায় সঙ্গীর হাত দুটোর ভাসান ঘটলো, একই সঙ্গে আমার চোখ হারালো তার নিরাপত্তার আশ্রয়।

এমন হৃদয়বিদারক দৃশ্য হজম করে অন্যের উপকারে অটল থাকা কঠিন, অস্বীকার করবো না স্বার্থপরের মতো আমি তাই সঙ্গীর দাড়ি রক্ষার তাগিদ ভুলে নিজের অরক্ষিত চোখ দুটো রক্ষায় মরিয়া হয়ে নিজের হাত দুটো দিয়ে দুচোখ ঢাকলাম। কর্মের ফল হাতেনাতে পেয়েও গেলাম। এবার একই রকম পিলারের ধাক্কায় আমার হাত দুটো উড়ে গেল। এতক্ষণ আমরা দুজন একসাথে পড়তে থাকলেও এই প্রথম আমরা পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম।

তবে এটা নিয়ে আমি বিশেষ আফসোস বা অভিযোগ করি না। কারণ আমার চোখ দুটো শেষমেশ নিরাপদে আলগোছে ঘাসের ওপর নেমে এসেছে। সে চোখ দিয়ে দেখতে পাই খানিক দূরে আমার সঙ্গীর চমৎকার ধূসর দাড়িগুলো মাটির ওপর পড়ে ঝকমক করছে।

মূলগল্প: The Fall(1944) by Virgilio Pi-era Translations by Mark Schafer

জাহান্নাম

ছোটো বেলায় মা-বাবার মুখেশোনা ‘জাহান্নাম’ শব্দটাকে শয়তান সাদৃশ্য ভাবনা ছাড়া অন্যকিছু মনে হতো না। এরপর শৈশব পেরিয়ে যখন আরেকটু বড় হলাম,

নরক যন্ত্রণাময় অনন্ত দিনরাতের এপাশ-ওপাশের অভিজ্ঞতায় জাহান্নাম সম্পর্কিত ধারণায় জটিলতার রঙ চড়তে শুরু করে। বয়স বেড়ে আরো পরিণত হওয়ার পর, এক সময় এই যুক্তিতে আয়নায় নিজেদের চেহারা দেখা ছেড়ে দিলাম, মনুষ্য চেহারায় শয়তানের ছাপ বসে গেছে। এই বোধটা আমাদের জাহান্নাম বিষয়ক যন্ত্রণাময় ভাবনাকে দূরে হটিয়ে দেয়। বৃদ্ধ বয়সে জাহান্নাম নাগালের মধ্যে চলে আসায়, নিজেদের স্বার্থে সেটাকে আমরা মন্দেরভালো জাতীয় কিছু একটা ভেবে নিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ি, অবশ্য মাঝেমধ্যে চিন্তাগ্রস্তও হতে হয় বৈকি। এরপর বয়সটা এমন স্তরে পৌঁছায়, যখন জাহান্নামের আগুনে বসেই হাসিকান্নার মহড়ায় দিয়ে যেতে হয়; আর যন্ত্রণাময় অবস্থাটা মানিয়ে নেবার জন্য 'সবই সম্ভব' এ-ভাবনায় নিজেদের প্রবোধ দিতে হয়। জাহান্নামের আগুনে পুড়তে অভ্যস্ত হয়ে পড়ি আমরা। দীর্ঘ একহাজার বছর পর, আঁধারমুখো শয়তান আমাদের প্রশ্ন করে- আমরা কেন এমন ভোগান্তি নিরন্তর সহ্য করছি। তার উত্তরে আমরা বলি, এটা ভোগান্তির চেয়েও অভ্যস্ততার ব্যাপার। শেষমেশ একদিন ছুটির ঘন্টা বাজে, কিন্তু এতদিনের অভ্যস্ততা ঠেলে, জলন্ত অগ্নিকুণ্ড ছেড়ে- অন্য কোথাও- অন্য কোনোখানে যাওয়াটাকে আমরা প্রত্যাখান করি। কেননা এতদিনে আমরা অভ্যাসের দাসত্ব মেনে নিয়েছি। দীর্ঘে দিনের অভ্যস্ততার মায়া কেইবা ছাড়তে চায়?

মূলগল্প: Hell(1956) by Virgilio Pi-era Translations by Mark Schafer

লেখক পরিচিতি:

ভার্জিলিও পিনেরা(Virgilio Pi-era) কিউবার কারদেনাসে ৪ আগস্ট ১৯১২ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর বাবা কারদেনাস শিক্ষাবোর্ডের সেক্রেটারি হিসেবে প্রথম জীবনে কাজ করেন। পরে কারদেনাস একোইডাক্ট(aqueduct) বিভাগের প্রশাসক হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। মা ছিলেন স্কুল শিক্ষিকা। ১৯২৩ সালে তাঁরা সপরিবারে হাভানায় বসবাস শুরু করেন। কবিতা দিয়ে তাঁর লেখালিখির সূচনা হয়। প্রথম কবিতা এল গ্রিটো মুডো El Grito Mudo (The Mute Scream) ১৯৩৬ সালে প্রকাশিত হয়। ১৯৩৭ সালে প্রথম রচিত নাটক ক্ল্যামার এন এল পেনাল(Clamor en el Penal (Noise in the Penitentiary)। এই নাটক রচনার মধ্যে দিয়ে দর্শনশাস্ত্রে ডিগ্রীধারী পিনেরা পুরোদস্তর লেখক জীবনে প্রবেশ করেন। তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত কবিতা সৃষ্টি হলো 'লা ইসলা এন পেসো' La isla en peso (The Island in Weight) ১৯৪৩ সালে প্রকাশিত হয়। এছাড়া তাঁর অন্যান্য রচনাবলীর মধ্যে রয়েছে সাহিত্য সম্পর্কিত প্রবন্ধগুচ্ছ, সাহিত্য সমালোচনা। ছোটো গল্পের সংকলন যা 'কোল্ডটেলস' শিরোনামে পরিচিত, এটি ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা লাভ করে। পিনেরা অসংখ্য নাটক রচনা করেন। যার অনেকগুলোই দর্শকের সমাদর পেয়েছিল। তাঁর গল্পে উদ্ভট আর অলৌকিক ব্যাপারের কেমন একটা

মেলবন্ধন চোখে পড়ে যা কাফকাসুলভ বলে বোদ্ধাদের মতামত। পিনেরার অনুবাদিত সাহিত্য সৃষ্টি বিংশ শতকের স্বৈরশাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ বা প্রতিরোধের খতিয়ান হিসেবে পাঠকের সামনে উপস্থিত হচ্ছে। সমাজ-রাজনীতি সচেতন এই গুণী মানুষটি ১৯৭৯ সালের ১৪ অক্টোবর হাভানায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

ইসমত চুগতাই এর গল্প

বিষ

মূল উর্দু থেকে অনুবাদ: সফিকুন্নবী সামাদী

[ইসমত চুগতাই (১৯১৫-১৯৯১) ভারতীয় ঔপন্যাসিক, ছোটগল্পকার, চিত্রনাট্যকার। বিশ শতকের শ্রেষ্ঠ উর্দু কথাকারদের একজন। নারীজীবন, প্রেম, যৌনতা, শ্রেণী-সংঘর্ষ তাঁর গল্পের বিষয়। কথাশিল্পে নিজের সময়কে তুলে ধরতে সিদ্ধহস্ত। যুক্ত ছিলেন প্রগতি লেখক সংঘের সঙ্গে, বিশ্বাস ছিল তাঁর বাস্তববাদে। 'বিষ' পল্লটি অনুবাদ করা হয়েছে মূল উর্দু থেকে।]

কী আশ্চর্য মৃত্যু! যারা গত সন্ধ্যায় মিসেস নোমানের সাথে চা পান করেছেন, সভায় তাঁর বক্তৃতা শুনেছেন তাঁরা তো তাঁর মৃত্যুর কথা বিশ্বাসই করতে পারেন না। অনিদ্রার কষ্ট ছিল তার অনেক বছর থেকেই, আর ঘুমের বড়ি তিনি আজ থেকে খাচ্ছেন না যে ভুল-ভ্রান্তির কোন প্রশ্ন আসবে।

প্রতিদিনের মতো রাত বারোটার দিকে ফেরেন। মিস্টার নোমান দশটার দিকে ঘুমিয়ে পড়তে অভ্যস্ত। তার ঘরের দরজা দস্তুরমতো বন্ধ ছিল। আয়া রাতের খাবারের কথা বলে, কিন্তু মিসেস নোমান

মানা করে দেন। দুধের কথা জিজ্ঞাসা করে। বলেন, 'নিয়ে এসো।' কিন্তু দুধে তিনি হাতও লাগান নি। রাত জাগার পর সাধারণত তাঁর বেলা পর্যন্ত ঘুমানোর অভ্যাস। মিস্টার নোমান অফিসে চলে গেছেন। এগারোটা বাজার পরও যখন মিসেস নোমান চায়ের জন্য ডাকছেন না তখন আয়ার একটু চিন্তা হয়। তাঁকে জাগানোর জন্য পায়ে হাত দেবার সাথে সাথে এমন চিৎকার করে ওঠে যেন সে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়েছে। ডাক্তার বলেন, মৃত্যু হয়েছে রাত দুটো থেকে তিনটের মধ্যে। অধিক সংখ্যক ঘুমের বড়ি খাবার কারণে এই ঘটনা ঘটেছে।

মিসেস নোমানের মৃত্যুতে পুরো শহরে হইচই পড়ে গেছে। তার বন্ধু-বান্ধব এবং জানাশোনা লোকের সংখ্যা অনেক। তাছাড়া সোশ্যাল ওয়ার্কের কারণে শ্রমিক এলাকায় তিনি যাওয়া-আসা করতেন। তিনি নার-শিক্ষার জবরদস্ত সমর্থক ছিলেন, ছিলেন নারী-অধিকারের পতাকাবাহক! তাঁর আকস্মিক এবং অসময় মৃত্যুতে কত স্কুল বন্ধ হয়ে যায়। কয়েক মাস ধরে শোকসভা চলতে থাকে।

আল্লাহ মিসেস নোমানকে কী দেননি। লক্ষপতি পিতার একমাত্র কন্যা, সুন্দরী, শিক্ষিতা। কলেজ থেকে বি.এ. পাস করে বের হবার সাথে সাথে প্রেমিকের কিউ পড়ে যায়। মিসেস নোমান শৈশব থেকেই দারুণ মেধাবী। টেনিসের চৌকস খেলোয়াড়, প্রথম শ্রেণীর ঘোড়সওয়ার, সাঁতারে জিতেছেন অনেক পদক। এমন সেতার বাজান যে মনে হয়, ওস্তাদ বিলায়েত হোসেন বাজাচ্ছেন। অত্যন্ত মিষ্টভাষিনী। যে সভায় তিনি যান সকলকে প্রভাবিত করে ফেলেন। যার সাথে একবার দেখা হয় তার মন মুঠোয় পুরে ফেলেন।

যে সময় মুসলিম লীগ শক্তিশালী হতে শুরু করে, তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করে নিজের জোরদার বক্তৃতায় লীগের পক্ষে কথা বলতে থাকেন। দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম করে আন্দোলনে অংশ নিয়ে তিনি মানুষের প্রশংসা অর্জন করেন। একসময় পর্দা-প্রথার বিরুদ্ধে মেয়েরা যে আন্দোলন গড়ে তুলেছিল মিসেস নোমান ছিলেন তার অগ্রণী। তিনি সেই স্বল্পসংখ্যক নারীর একজন যাঁরা পর্দার অভিশাপকে দূরে ছুঁড়ে ফেলে কর্মভূমিতে নেমে এসেছেন।

যে এলাকায় ডেপুটি নোমান বদলি হয়ে যান তার ভাগ্য খুলে যায়। যাবার সাথে সাথে মিসেস নোমান ক্লাব এবং বিভিন্ন কমিটির নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে নিয়ে নেন। সাধারণ মানুষের পরলোক সংশোধনের অপরিসীম আগ্রহ তাঁর। তিনি সত্যিকার অর্থেই মিস্টার নোমানের দক্ষিণ হস্ত। মেহমানদারীতে এমন পটু

যে বড় বড় পার্টির ব্যবস্থা করা তাঁর বাম হাতের খেলা। মিস্টার নোমান চাপা স্বভাবের মানুষ। তাঁর জীবন-সঙ্গিনী এমন শ্রেষ্ঠ যোগ্যতাসম্পন্ন না হলে তিনি এত উন্নতি করতে পারতেন না, সোসাইটিতে তাঁর এই পজিশন হত না যাকে মানুষ দেখে ঈর্ষার চোখে। উচ্চ পদও তিনি পেয়েছেন মিসেস নোমানের কল্যাণে অথবা তার পিতার প্রভাবের বদৌলতে। নইলে মিস্টার নোমান তাঁর বাল্যকালের বাগদত্তা আয়েশা বেগমকে ত্যাগ করতেন না।

আয়েশা বেগম মিস্টার নোমানের বিয়ের পর আজীবন কুমারী থাকার কসম খেয়েছিলেন। তিনি একটি স্কুলের শিক্ষিকা। পিতা-মাতার মৃত্যুর পর তিনি স্কুল প্রাঙ্গণকেই নিজের ঘর বানিয়ে নেন, সেখানে তিনি এক নিরস অর্ধমৃত জীবন যাপন করেন।

হৃদয়ের ব্যাপারে মিসেস নোমান বড় কপাল নিয়ে এসেছেন। বন্ধুমহলে তাঁর প্রেমিকের একটা বড় সংখ্যা ছিল। একসময় মিসেস নোমান সৌন্দর্যের এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে বিবেচিত হতেন। কলেজে পড়বার সময় একাধিক তরুণ তাঁর প্রেমে পড়ে আত্মহত্যা করেছে। তাঁর সময়কার প্রগতিশীল কবি তাঁর সৌন্দর্যে প্রভাবিত হয়ে সাহিত্য রচনায় উচ্চ সাফল্য অর্জন করেছেন। কত গল্প-লেখক তাঁর ব্যক্তিত্বের ছায়ায় প্রাণ দান করেছে। তাঁর নামে অজস্র বেনামী প্রেমপত্র আসত। সেগুলো সঙ্কলিত ও প্রকাশিত হয় জনপ্রিয় হয়েছে। যদিও কিছু ঈর্ষাকাতরের বক্তব্য হল, এগুলো মিসেস নোমান নিজেই লিখেছেন। যদি এই অমূলক অভিযোগ মেনেও নেয়া যায়, তবুও এই পত্রগুলি সাহিত্যিক সম্পদের মর্যাদা পাবার যোগ্য এবং এগুলো প্রমাণ করে যে ভাষা ও সৌন্দর্যের দিক দিয়ে মিসেস নোমান উচ্চমানের সাহিত্যিকও।

নানা ধরনের সামাজিক কর্মের মধ্যে তিনি নারী-শিক্ষার ওপর জোর দেয়া ছাড়াও স্বল্প সন্তান জন্ম দেবার পক্ষে প্রচারণা চালান। তাঁর ধারণা, ডজন ডজন সন্তান আমাদের দেশের দারিদ্র্যের জন্য সবচেয়ে বেশী দায়ী। এরা দারিদ্র্যের উৎপাদন এবং এদের কারণেই দারিদ্র্য চরমে পৌঁছে। কেবলমাত্র গ্রাম্য অশিক্ষিত নারীই এমন কষ্ট করে সন্তান জন্ম দেয়। তাই সন্তান অশিক্ষা এবং গ্রাম্যতার জীবন্ত প্রমাণ। সভ্য নারীর এরকম যেন-তেন ভাবে সন্তান হয় না।

আমার মনে আছে, দশ সন্তানের জননী আমার আম্মা মিসেস নোমানকে ভয় পেতেন। তাঁর অশিক্ষার জীবন্ত প্রমাণ অর্থাৎ আমরা মোটাতাজা দশ সন্তান

মিসেস নোমানকে পাশ কাটিয়ে চলতাম। আমাদের ময়লা হাঁটু এবং ফোঁড়ায় ভরা পা দেখে তিনি কেঁপে উঠতেন। আমাদের চিৎকার-চেঁচামেচিতে তাঁর মাথায় ব্যথা উঠে যেত, আমাদের খাইখাই স্বভাব দেখে দস্তরখানার ওপর বমি আসত তাঁর। কিন্তু তাঁর অভ্যাস ছিল বিনা খবরে চলে আসবার। আম্মার মনে হত, লজ্জায় ডুবে মরেন। আমরা আহমকের মত চারিদিক থেকে ঘিরে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকতাম। কোনো কোনো পোড়ামুখী বলত, মিসেস নোমান বন্ধা।

তিনি চলে যাবার পর আম্মা কিছুদিন আমাদের ওপর পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালাতেন। আমাদের শিকনি পড়া নাকে চিমটা দিয়ে ছ্যাকা দেয়ার হুমকি দেয়া হত। দোজখের আজাবের মতো আমাদের পায়ে জুতো গলিয়ে দেয়া হত। মারপিট করতে করতে আম্মা ক্লান্ত হয়ে যেতেন। শেষ পর্যন্ত আম্মার আনাড়ী স্বভাব আমাদের পক্ষেই যেত, আর আমরা পুনরায় স্বাধীন হরিণের মত লাফাতে শুরু করতাম।

মিসেস নোমান লক্ষবার আমাদের নাজিল হওয়া বন্ধ করার উপায় বলেন, কিন্তু আমাদের আব্বা কি জানি কেমন মানুষ ছিলেন। তাঁর সহযোগিতা ছাড়া এ বিষয়ে সফলতা আসবে কেমন করে? তিনি পারলে আমাদের জোড়ায় জোড়ায় নিয়ে আসতেন। তিনিই আমাদের জংলীদের মতো এই স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছিলেন।

বড়লোকের শত্রুও থাকে অনেক। মিসেস নোমানের এই সর্বজনপ্রিয়তা দেখে ঈর্ষাকাতর অনেক লোক নানারকম কথা বলত। মুখের ওপর বলার সাহস ছিল না কারোর।

‘শুনেছেন আপনি, কেমন ছোটলোক সব!’ তিনি হেসে নিজেই বলেন, ‘নোমান সাহেবকে তো আপনি চেনেন, তিনি এমন নীচ হতে পারেন?’

‘না আপা, লোকে কত কথা বলে যার কোনো মাথামুণ্ডু নেই।’ আম্মা মিসেস নোমানের মর্জি মতো বলেন, ‘আপা, উনি তো আপনার জন্য পাগল। আর হবেন না কেন? এমন কী ভাল গুণ আছে যা আপনার মধ্যে নেই? যেমন যোগ্য তেমনি শিক্ষিত। আপনার মত সকল স্ত্রী হলে, খোদার কসম, আমাদের দেশ এত পেছনে পড়ে থাকত না।’ আম্মা প্রচারিত পাঠ পুনরোচ্চারণ করেন।

‘না আপা, আমি তো একটা বুদ্ধু, কী যোগ্যতা আছে আমার?’ তিনি অত্যন্ত বিনম্র স্বরে বলেন।

‘আপনি বিনয় করছেন, নইলে আপা, আপনি আসাতে শহরের অবস্থা বদলে গেছে। কেমন অশিক্ষা ছিল সাধারণ মানুষের মধ্যে।’ আম্মা সেই নতুন নিবন্ধ থেকে উদ্ধৃত করেন যা সম্প্রতি স্থানীয় পত্রিকায় ছাপা হয়েছে, ‘তিনি আসবার আগে নারী-শিক্ষা অসম্ভব খারাপ অবস্থায় ছিল।’ আম্মা মাখন লাগাতে থাকেন যাতে মিসেস নোমানের মনোযোগ এদিকে থাকে এবং মুরগির পেছনে দৌড়াতে থাকা বজ্জাত বাচ্চাদের তিনি না দেখেন, যাদের তিনি ইশারায় দূর হয়ে যেতে বলছিলেন। মিসেস নোমান আমাদের দেখে ফেললে সমস্ত সংশোধন ত্যাগ করে তিনি আমাদের সংশোধনের জন্য কোমর বেঁধে লেগে যেতেন এবং আমাদের নাকের ওপর নির্যাতন নেমে আসত।

‘আল্লাহর কসম, কখনো কখনো তো আপনার ভাইয়ের ভালোবাসায় অস্থির হয়ে যাই। এটা কোনো কথা হল, যেদিন ডিটনারে আমি না থাকি, ও না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে।’ আম্মা জানতেন, এ নেহায়েতই গপ্পো। কিন্তু তিনি স্বপ্নেও মিসেস নোমানের বিরোধিতা করতে পারতেন না। নিজের পরকাল মাটিতে মেশানোর কোনো ইচ্ছা তাঁর ছিল না। কিন্তু কি জানি কেমন করে মুখ থেকে বেরিয়ে যায়, ‘অন্যকোথাও খেয়ে আসেন হয়তো।’ বলে তো ফেললেন, তারপর ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি বলেন, ‘লোকে বলে আপা...’

‘লোকে তো সাদা কাপড়ে কাদা ছিটাতে মজা পায়। তারা তো সেই নীচ বুদ্ধির লোক যারা আমাদের জাতিকে এতটা অশিক্ষা আর মন্দ বুদ্ধির হতাশায় ডুবিয়ে রেখেছে। দুনিয়া জানে, মিস্টার নোমান কী রকম চরিত্রের লোক। স্ত্রীর কাছে কেউ মনের কথা লুকিয়ে রাখতে পারে? খোদা নাখাস্তা যদি এমন কিছু ব্যাপার থাকত, আমার কাছে লুকিয়ে রাখতে পারত না।’ তিনি আম্মার দিকে তাকান, ‘আপা, আপনি তো সরল মানুষ।’ তাঁর বলার উদ্দেশ্য ছিল, আপনি তো নির্বোধ, নিতান্ত অশিক্ষিত। ‘কিন্তু নোমান সাহেব আমার কাছে কোনো কথা লুকাতে পারেন না।’

‘হ্যাঁ আপা, আপনার কাছে কীভাবে কেউ কথা লুকাতে পারবে।’ আম্মা স্বীকার করেন।

‘আর লোকে যদি বলেই তবে সেটা কার জন্য? আয়েশা বেগমের জন্য। দেখেছেন আপনি আয়েশা বেগমকে?’

‘হ্যাঁ, শুকনো খটখটে... তওবা তওবা!’

‘না আপা, মানুষের বাচ্চা। কান ধরে বলছি, খোদা বড় কথা না বলাক। আমি নিজে, না রূপে না চেহারায়, ভিড় থেকে বাইরে আয়... কিন্তু... তওবা... তার চেহারায় তো কেবল...’

‘মুহররমের মাতম লেগে থাকে।’

‘দুর্ভাগ্য ঠিকরে বের হয়।’

‘পুরুষের প্রেম না পেলে মেয়েদের চেহারা থেকে লানত ঝরতে থাকে।’

‘হায়-হায় ভাই, এই সারা জীবনের কুমারীত্বও চেহারাকে বিকৃত করে দেয়।'

অনেকক্ষণ পর্যন্ত আম্মা এবং মিসেস নোমান বসে বসে চিকিৎসাশাস্ত্র এবং সামাজিক নিয়মের বরাত দিয়ে আয়েশা বেগমের চেহারার আদি দুর্দশার বিশ্লেষণ করতে থাকেন। তওবা তওবা করতে থাকেন এবং মিসেস নোমানের মধুর বচন উৎকর্ষে পৌঁছতে থাকে।

‘যাকগে এখন তো বেচারী অসহায়। এমনিতেও সে কখনো তো আপনার ধারে-কাছে ছিল না। হলে ছোটবেলার বাগদত্তাকে ছেড়ে আপনার সাথে কেন ঘর বাঁধবে? লোকে বলে, ডেপুটি কালেক্টরীর লোভে নোমান সাহেব তাকে ত্যাগ করেছেন।’ আম্মা মাঝে মাঝে সরলভাবে এমন বাজে কথা বলে ফেলেন।

‘এসব বাজে কথা আপা।’ মিসেস নোমান উত্তেজিত হয়ে যান, ‘নোমান সাহেব, এতগুলো মানুষকে পালতেন কী করে। তার আত্মীয়রা একথা ছড়িয়েছে। আপনি একবার ভাবুন, আধা ডজন ভাই বোনের ভার যে সে কথা? আয়েশা বেগম বংশের মেয়ে। বংশের লোকেরা সব সময় তার পক্ষে কথা বলেছে। কিন্তু সত্য

কথা হল আপা, কোনো মেয়ের মধ্যে নিজস্ব ক্ষমতা না থাকলে কেউ তার অধিকার রক্ষা করতে পারে না। তার মধ্যে এতটুকু আকর্ষণ থাকলে নোমান সাহেব তাকে ত্যাগ করবেন কেন?'

'আল্লাহর দেয়া চেহারা বেচারীর।' আম্মা বলেন।

'আল্লাহ চেহারা দিয়েছেন, সাথে সাথে বুদ্ধিও তো দিয়েছেন। যত্ন-আত্তি, কাপড় চোপড়েরও তো ব্যাপার আছে। ঠিকমতো সাজগোজ করলে সাধারণ চেহারাও সুন্দর দেখায়। কথাবার্তা বলারও তো কোনো ঢঙ নেই তার। কি অসম্ভব বোরিং আয়েশা বিবি। সত্যি করে বলুন, তার কথার মধ্যে কোনো রকমের প্রাণ আছে? কোনো আকর্ষণ আছে?'

'না আপা, আমারতো প্রাণ অস্থির হয়ে যায় তার সামনে। যেন চুপ থাকবার রোজা রেখেছে।'

'ইউরোপ-আমেরিকায় তো রীতিমতো এধরনের স্কুল আছে যেখানে পুরুষের জন্য নিজেকে আকর্ষণীয় করে তুলতে শেখানো হয় মেয়েদের। এই জন্যই তো আমরা সমস্ত দুনিয়ার পেছনে।' মিসেস নোমানের বক্তৃতা শুরু হয়ে যায়।

একদিন মিসেস নোমান নারীর আত্মসম্মান এবং অধিকার সম্পর্কে আম্মার কানে এমন মন্ত্র দিয়ে যান যে সেদিন আম্মা আব্বাকে বলেন, 'তুমি ইংরেজ মহিলাদের সাথে এমন হেসে হেসে কথা বলো কেন?'

'চলো তুমিও আমার সাথে। তুমিও তাদের স্বামীদের সাথে হেসে হেসে কথা বোলো।' আব্বা মৃদু হেসে জবাব দেন।

'হায় হায়... তওবা!' আম্মা মাথায় হাত দিয়ে বসেন। সেদিন থেকে আর কখনো স্ত্রীর অধিকার ফলানোর সাহস তাঁর হয়নি।

মিসেস নোমান কখনো নিজেও নোমান সাহেবকে ক্ষ্যাপান, 'তুমি বেচারীর জীবন বরবাদ করে দিয়েছ।' কিন্তু তিনি হেসে উড়িয়ে দেন।

‘বেচারী নিশ্চয়ই আমাকে উঠতে-বসতে শাপ-শাপান্ত করে।’ নোমান সাহেবের চেহারায় লজ্জার আভাস দেখা যায়।

‘সত্যি করে বলো তো, আয়েশা বেগমকে কি তুমি ছোটবেলা থেকেই অপছন্দ করতে?’

‘অনেকটা এরকমই।’ নোমান সাহেব আবার এড়াতে চান।

‘তাহলে কি পরিবারের লোকজন জোর করেই পাকা কথা করিয়েছিল?’

‘অসহায়তা মানুষকে দিয়ে সবকিছুই করিয়ে নেয়।’ তিনি শীতল দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মিসেস নোমানের চুলের গোছা নিয়ে খেলতে থাকেন।

‘পুরুষ কত ধোকাবাজ!’ তাঁর মন মিস্টার নোমানের প্রেমে নেচে ওঠে। মিস্টার নোমান সঙ্কোচে সিগার-কেস নিতে নিতে অন্যদিকে ঘুরে যান।

মিসেস নোমানের হৃদয় এক বহতা নদী যার মধ্যে সমস্ত দুনিয়ার বেদনা। আয়েশা বেগমের জন্য তো তার অসীম করুণা। বেচারী! ডেপুটি কালেক্টরের সাথে বিয়ে হলে কেমন ঠাটবাটে থাকত। ডিনার, পার্টি এ্যাট-হোম। কিন্তু বেচারী ছাই কন্ট্রোল করতে পারত না, বাচ্চা দিয়ে ঘর ভরে দিত। মিসেস নোমান অন্তত এই অসুখ থেকে তো ঘরকে পবিত্র রেখেছেন।

‘হিন্দুস্তানে এত বাচ্চা আছে যে, যে নারী সন্তান জন্ম না দেয় সে দেশ ও জাতির সবচেয়ে বড় সেবা করে।’ মিসেস নোমান বলতেন।

কিন্তু এসব ভাববার সময় তিনি ভুলে যান যে যদি আয়েশা বেগমের বিয়ে নোমান সাহেবের সাথে হত তবুও আজ পর্যন্ত সে স্কুলে মাস্টারি করত। স্কুল পরিদর্শন উপলক্ষে কখনো কখনো আয়েশা বেগমের সাথে তাঁর দেখা

সাক্ষাৎ হয়। বোঝাই যায়, আয়েশা বেগম তাকে ঈর্ষা করে। যদিও এতে না তাঁর কোনো দোষ আছে না নোমান সাহেবের। ঝলমলে এক চাঁদ ছেড়ে কেমন করে

এক শুকনো মৃতপ্রায় অম্ল স্বাদের টুকরো নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবে কেউ।

লোকে বলে, সভায় সভাপতিত্ব করবার পর তিনি স্কুলের পেছনে আয়েশা বেগমের কোয়ার্টারের দিকে চলে যান।

'চা খাওয়াবেন না?' যথারীতি সুশীল ভঙ্গিতে তিনি বলেন। আয়েশা বেগম সকলকে বসিয়ে নিজে চা বানিয়ে নিয়ে আসেন। মিসেস নোমান তাকে হামেশাই খোঁচান, সেদিনও বলেন, 'আপা, আমি আপনার হবু স্বামীকে ছিনিয়ে নিয়েছি, কিন্তু এতে আমার কী দোষ ছিল?' আয়েশা বিবি লজ্জিত হয়ে মৃদু হাসেন।

'না বেগম, আপনার দোষ হবে কেন?'

'নিশ্চয়ই আমার ওপর খুব রাগ হয় আপনার?' মিসেস নোমান আবারও হাসেন। আয়েশা বেগমের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়, সহনশীলতার সাথে বলে, 'রাগের কী আছে বেগম? সব ভাগ্যের খেলা।'

'ভাগ্য! হুঁহ্! সেই অশিক্ষিতের মত কথা। এই কথাতেই তো আমাদের দেশের নির্বোধ মেয়েরা নিজেদের জীবনকে দোজখ বানিয়ে রেখেছে। পুরুষ নারীকে বিফল করে কাঁদিয়ে চলে যায় আর নারী মুখে তালা লাগিয়ে বসে থাকে।' মিসেস নোমান বক্তৃতাবাজী শুরু করে দেন। সেদিন সৈয়দা আয়েশা বেগমের মেজাজ কোনো কারণে একটু খারাপ ছিল। কি জানি কেন মিসেস নোমানের তামাশায় একটু ক্ষুব্ধ হন। মাথা থেকে পা অবধি থর থর করে কাঁপতে থাকে তাঁর। কাটা কাটা বাক্যে বলেন, 'ছিনিয়ে নেবার কথা বলেছেন বেশ ভাল। বেগম, মানুষ কি মাটির খেলনা যে তাকে কেউ ছিনিয়ে নেবে? শরীর ছিনিয়ে নেয়া যেতে পারে, কিন্তু মন ছিনিয়ে নেয়া যায়না।'

'আরে বাহ! আপনি তো মনে হচ্ছে অনেক বড় দার্শনিক আয়েশা বেগম! এই শূন্যগর্ভ প্রেম...'

'প্রেম কখনো শূন্যগর্ভ হয়না বেগম! প্রেম জীবনের সবচেয়ে বড় সওদা।' রাগে আয়েশা বেগমের হাত-পা নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে যায়। বলেন, 'আপনি অত্যন্ত নির্বোধ বেগম!'

মিসেস নোমান এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীরা হাসতে হাসতে লুটোপুটি খায়। 'মিসেস নোমান নির্বোধ! কি চমৎকার কথা!'

‘ইরফান... আরে বাবা ইরফান!’ আয়েশা বিবি পর্দার ফাক দিয়ে উঁকি দিয়ে ডাকেন। রেকেট হাতে ষোল-সতের বছরের একটি ছেলে এসে দাঁড়ায়।

‘এদিকে এসো বাবা! খালাকে সালাম দাও।’

মিসেস নোমানের হাত থেকে চায়ের কাপ পড়ে যায়। তার সামনে বিশ বছর আগের নোমান সাহেব দাঁড়িয়ে এবং আয়েশা বেগম তার ঘন চুলে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলেন, 'আমার মরহুমা বোনের স্মৃতি। সালাম দাও বাবা।'

লোকে কানাঘুষা করে, আয়েশা বেগম মিসেস নোমানকে বিষ খাইয়ে দিয়েছেন।

নগুগিওয়াথিয়াঙ্গো এর গল্প

বৈভবের মুহূর্ত

অনুবাদঃ দিলশাদ চৌধুরী

তাঁর নাম ছিলো ওয়ানজিরু। কিন্তু তার খ্রিস্টান নামটা তার কাছে বেশি পছন্দের ছিলো, বিয়েট্রেস। এই নামটা আগেরটার চেয়ে বেশি পবিত্র আর সুন্দর শোনাতো। এমন নয় যে সে দেখতে কুৎসিত, কিন্তু তাকে সুন্দরীও বলা চলেনা। তার কালো, মাংসল দেহে সুন্দর আকার ছিলো, কিন্তু মনে হত যেন দেহটি ক্রমাগত অপেক্ষা করে যাচ্ছে আত্মার সংযোগে পরিপূর্ণ হতে। সে কাজ করত বিয়ার হলগুলোয় যেখানে বিভিন্ন ভদ্রমহিলাদের সন্তানরা আসত নিজেদের অন্তঃস্থ জীবনকে বিয়ারের ক্যানে ডুবিয়ে দিতে আর তারপর মাতাল হয়ে আবোলতাবোল বকতে। কেউ ওকে খেয়াল করত বলে মনে হয়না। একমাত্র, শুধু যখন কোনো মালিক কিংবা অধৈর্য খদ্দের ওর নাম ধরে ডাকাডাকি করত, বিয়েট্রেস; তখন অন্যান্য গ্রাহকরা সংক্ষেপে মাথা তুলত, কয়েক সেকেন্ডের জন্য, যেন দেখতে যে এত সুন্দর নামটাকে কে ধারণ করে আছে, কিন্তু তেমন কাউকে না দেখে, তারা তাদের মদ্যপান জারি রাখে, সাথে অশ্লীল তামাশা,

আর অন্যান্য পরিচারিকাদের সাথে হাসিঠাট্টা। ও যেন ওড়ার চেষ্টারত কোনো চোট লাগা পাখিঃ না চাইতেও পতন এখন তখন। কিন্তু তবুও ও ভেসে বেড়ায় জায়গায় জায়গায় যেন ওকে বিভিন্নভাবে পাওয়া যায় আলাস্কা, প্যারাডাইস, দ্যা মডার্ন, থোম কিংবা পুরো লিমুরুতে ছড়িয়ে থাকা অন্যান্য বিয়ার হলগুলোতে। অবশ্য কিছুক্ষেত্রে কারণটা হত যে কোনো ক্রুদ্ধ মালিক হয়ত হঠাৎ আবিষ্কার করত ও যথেষ্ট খদ্দের আকৃষ্ট করতে পারছেনা; তারপর ওকে তাড়িয়ে দিত কোনোরকম নোটিস কিংবা বেতন ছাড়াই। ও টলতে টলতে কাজ নিত পরবর্তী মদ্যশালায়। কিন্তু কিছু সময় ও স্রেফ ক্লান্ত হয়ে উঠতো এক জায়গায় থাকতে থাকতে, একঘেয়ে দৃশ্যের রোজকার সাক্ষী। ওর চেয়েও কুৎসিত বলা চলে এমন মেয়েদের নিয়ে দোকান বন্ধের সময়ে দাবিদারদের ঝগড়া লেগে যায়। ওদের কি এমন আছে যা আমার নেই? ও নিজেকে জিজ্ঞেস করে, হতাশ হয়ে। ও একটা মদ্যশালার রাজত্বের স্বপ্ন দেখে যেখানে ও একমাত্র না হলেও শাসকদের মধ্যে একজন থাকবে, যেখানে প্রজারা সব বিয়ারের ভেট নিয়ে আসবে, সাথে হতাশায় নিমজ্জিত হাসি আর প্রায়ই গালাগাল যাতে ঘৃণার চেয়ে বেশি প্রেম আর কাম লুকিয়ে থাকবে।

বিয়েট্রেস মূল লিমুরু শহর ছেড়ে আশেপাশের মাশরুমের মত গজিয়ে ওঠা শহরতলীগুলোতেও চেষ্টা করেছিলো। ও কাজ করেছে নগারারিগা, কামিরিথো, রাইরোনি এবং এমনকি টিয়েকুনুতেও আর প্রত্যেক জায়গায় একই কাহিনি। ওহ হ্যা, মাঝেমধ্যে ও খদ্দের পেতো; কিন্তু কেউই ওকে ততটা পাত্তা দিতোনা যতটা ও চায়, কেউই ওকে ততখানি চাইতোনা যতটা চাইলে ওকে পাওয়ার জন্য যুদ্ধ লাগিয়ে দেয়া যায়। ও ছিলো সবসময় কোনো অসচ্ছল খদ্দেরের শেষ ভরসা। এমনকি কোনো ছলনাও না, অন্তত ওর ক্ষেত্রে, টুস্কারের পঞ্চম বোতলের পর পুরুষ প্রশ্রয়ের যে মিষ্টি ভাণটা করে। পরের রাতে কিংবা বেতনের দিন, সেই একই খদ্দের এমন ভাব করত যেন ওকে চেনেই না; সে গিয়ে তার পয়সার ক্ষমতা এমন মেয়েদের দেখাবে যারা ঝুলিতে ইতিমধ্যেই একগাদা প্রেমিক পুরুষ নিয়ে বসে আছে।

এতে সে ক্ষুব্ধ হতে লাগলো। অতঃপর প্রতিটি মেয়েকেই প্রতিপক্ষ ধরে নিয়ে এক বিরূপ ভঙ্গি আশ্রয় করে নিলো। বিশেষত, ন্যাগুথি ছিলো সেই কাঁটা যেটা তার ক্ষত থেকে মাংস তুলে আনতো। ন্যাগুথি, অহংকারী আর নির্লিপ্ত, কিন্তু পুরুষগুলো সবসময় ওর আঙিনাতেই; ন্যাগুথি, পুরুষগুলোর সাথে ঝগড়া লাগিয়ে দিত, আর ওকে শান্ত করার জন্য তারা নিয়ে আসত বিভিন্ন উপহার যেগুলো ও গ্রহণ করত নিজের অধিকার হিসেবে। ন্যাগুথিকে কখনো একঘেয়ে লাগত, অস্থির কিংবা ক্রমশ নিম্নগামী চরিত্রের ঝগড়ুটে আর তারপরও পুরুষগুলো গিয়ে এমনভাবে ওর সাথে চিপকে থাকে যেন এক স্বাধীন নারীর তীব্র অসহ্য বাক্য, মুখ ভেংচি আর নিরাসক্ত চোখের চাবুক ওদের প্রভূত আরাম দিচ্ছে। ন্যাগুথিও ছিলো এক যাযাবর পাখি, কখনোই এক জায়গায় স্থির হতে পারেনি, কিন্তু ওর

ক্ষেত্রে কারণটা ছিলো বৈচিত্র্য আর উত্তেজনার জন্য ওর ক্ষুধাঃ জয় করার জন্য নতুন মুখ, নতুন অঞ্চল। বিয়েট্রেস এমনকি ওর ছায়াকেও অপছন্দ করত। ও ন্যাগুথির মধ্যে সেই মেয়েটাকে দেখতে পেয়েছিলো যেমনটা ও নিজে হতে চায়, একটা মেয়ে যে কিনা দুটোই, মদ্যশালার সন্ত্রাস ও যৌনতার পাপপুরীতে পুরোপুরি ডুবে গিয়েও ভেসে থাকা একটা মেয়ে। বিয়েট্রেস যেখানেই যাকনা কেন, ন্যাগুথির বিস্তীর্ণ ছায়া আগে বা পরে তাকে অনুসরণ করে চলেই আসে।

ও লিমুরু থেকে পালিয়ে এসেছিলো চিরি বিভাগের ইলমোরগে যাবার জন্য। ইলমোরগ এককালে বেশ একটা ভৌতিক গ্রাম ছিলো, কিন্তু এটি যেন প্রাণ ফিরে পেয়ে পুনরুজ্জীবিত হয়েছে সেই কিংবদন্তী মহিলার কারণে, ন্যাঙ'এনডো, যাকে সমস্ত পপগানের দল তাদের শ্রদ্ধা জানিয়েছে। সেই ছিলো কারণ যার জন্য তরুণ মুথু আর মুচুন জি'ওয়া নেচে নেচে গেয়েছিলোঃ

ইলমোরগের জন্য যখন নাইরোবি ছাড়লাম

জানতে পারিনি কখনো,

আমি ধারণ করব এই বিস্ময় সন্তান আমার

ন্যাঙ'এনডো।

ফলস্বরূপ, ইলমোরগ সবসময়ই ছিলো একটা আশা জাগানিয়া শহর যেখানে তৃষ্ণার্ত আর নিপীড়িতরা পাবে বিশ্রাম আর তাজা পানির খোঁজ। কিন্তু আবার, ন্যাগুথি ওর পিছনে পিছনে চলেই এলো।

ও দেখলো যে কিংবদন্তী কিংবা নাচ গান সত্ত্বেও লিমুরু থেকে খুব বেশি আলাদা নয়। ও বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করলো। কাপড়? কিন্তু এমনকি এখানেও সে নিজের জন্য ঝলমলে কাপড় কেনার মত যথেষ্ট আয় করতে পারলোনা। একমাসে পঁচাত্তর শিলিং, তাও ঘরভাড়া ছাড়াই, এটা কি পোশো নাকি, মানে বেকার প্রেমিক? ততদিনে আম্বি ইলমোরগে পৌঁছেছে, আর বিয়েট্রেস ভাবলো এই এক সমাধান হতে পারে। সে কি লিমুরুতে তার চেয়েও কালো মেয়েদের ওই ত্বক সাদা করা ক্রিমগুলো মেখে রাতারাতি কালো কাউয়া থেকে সাদা রাজহংসে পরিণত হতে দেখেনি? আর পুরুষেরা তাদের জন্য যেন হা করে থাকে, বুক ফোলানো গর্বের সাথে তাদের নবজন্ম হওয়া প্রেমিকাদের সম্পর্কে বলে। পুরুষ অদ্ভুত প্রাণী, এসবের ব্যাখ্যা খুঁজতে খুঁজতে বিয়েট্রেস ভাবে। তারা আম্বি, বুটন, ফায়ারস্নো, মুনস্নো, পরচুলা, টান চুল এগুলোর ব্যাপারে সমানে বিষোদগার করত; অথচ তারা ওই আম্বি মেখে সাদা করা ত্বক আর ইউরোপীয়

বা ভারতীয় চুলের অনুকরণে করা পরচুলা মাথায় দেয়া মেয়েগুলোর পেছনেই ছুটতো। বিয়েট্রেস কখনো চেষ্টা করেনি নিজের এই কালো সত্তাটাকে ঘৃনা করার মূল কারণ খুঁজে বের করতে, সে সাধারণভাবেই এই স্ববিরোধীতাকে মেনে নিয়েছে আর যেন কিছুটা প্রতিহিংসা নিয়েই নিজেকে আম্বির কাছে সমর্পণ করেছে। তার এই লজ্জাজনক কালো রঙ তাকেই ঘষে সাদা করতে হবে। কিন্তু এমনকি খুব বেশি আম্বি কেনার সামর্থ্যও তার ছিলোনা ; সে ওটাকে শুধু তার মুখ আর হাতেই লাগাতে পারত, যার কারণে তার পা আর ঘাড় কালোই রয়ে যেত। এছাড়াও তার মুখমণ্ডলের কিছু জায়গাও ছিলো যেখানে তার হাত ঠিকঠাক পৌঁছাত না -- কানের পেছনে কিংবা চোখের পাপড়ির ওপর, আর এটা ছিলো তার আম্বিমাখা ব্যক্তিত্বের পক্ষে এক সার্বক্ষণিক লজ্জা আর যন্ত্রনার উৎস।

এই আম্বি মাখার সময়কালটা তার বিশেষভাবে মনে থাকবে তার পরবর্তী বৈভবের মুহূর্ত আসার আগ পর্যন্ত তার গভীর অপমানের স্মৃতির অন্যতম হিসেবে। সে কাজ করছিলো ইলমোরগের স্টারলাইট মদ্য ও অতিথিশালায়। ন্যাগুথি তার বালা পরা হাত আর বিরাট দুল পরা কান নিয়ে কাউন্টারের পেছন থেকে পরিবেশন করত। এখানকার মালিক ছিলো এক ভদ্র খ্রীস্টান লোক যে কিনা প্রতিদিন গির্জায় যেত আর সমাজসেবামূলক কাজের টাকা পরিশোধ করত। ভুড়িওয়ালা। ধূসর চোখ। নরম ব্যবহার। একজন সম্মানিত সংসারী ব্যক্তি, ইলমোরগে সুপরিচিত। যথেষ্ট পরিশ্রমীও, সে ততক্ষণ অব্দি মদ্যশালা থেকে যায়না যতক্ষণ না ওটা বন্ধ করার সময় আসে, অথবা বলা যায় যতক্ষণ না ন্যাগুথি চলে যায়। সে অন্য কারো দিকে ফিরেও তাকাতো না, ওর চারিপাশেই চক্কর খেত, আর কিজানি কেন ওকে পোশাকের উপহার কিনে দিত, তাও এমনকি একটা ভদ্রগোছের ধন্যবাদ পর্যন্ত পেত না। কেবল এক প্রত্যাশা ছাড়া, এক আগামীর প্রত্যাশা। অন্য মেয়েদের সে মাসে আশি শিলিং করে দিতো। ন্যাগুথির একটা নিজের কামরা ছিলো। ও তখনই ঘুম থেকে উঠতো যখন ওর তহবিলের ভার নিতে মন চাইতো। কিন্তু বিয়েট্রেস আর অন্য মেয়েদের পাঁচটায় উঠতে হত, অতিথিশালার লোকেদের জন্য চা বানাতে হত, মদ্যশালা আর বাসনকোসন পরিস্কার করতে হত। তারপর তারা মদ্যশালায় বদলি কাজ করত দুপুর দু'টো অব্দি, তারপরে ছোট একটা বিরতি নিয়ে পাঁচটা থেকে আবার শুরু, তখন আবার তাদের প্রস্তুত থাকতে হবে খদ্দেরদের জন্য ফেনাওয়ালা বিয়ার আর সুন্দর হাসি নিয়ে, রাত বারোটা কিংবা তারও বেশি সময় অব্দি যতক্ষণ না খদ্দেরদের টাস্কার আর পিলসনারের চাহিদা মেটে। যেটা মাঝেমধ্যেই বিয়েট্রেসকে বিরক্ত করত সেটা হলো মেয়েদের স্টারলাইটেই রাত কাটাতে মালিকের আরোপিত নিয়ম, অবশ্য ওর ক্ষেত্রে এটা হলে না হলে কিছুতেই ওর কোনো সমস্যা ছিলোনা। নইলে ওরা কাজে আসতে দেরী করবে, মালিক বলে। কিন্তু সে মূলত চাইতো মেয়েদের শরীর ব্যবহার করে রাতে অতিথিশালায় থাকার জন্য আরও খদ্দের টানতে। ন্যাগুথির নেতৃত্বে, বেশিরভাগ মেয়েরাই এই নিয়ম ভাঙতো আর দারোয়ানকে ঘুষ দিয়ে ভেতর বাহির করতো। তারা তাদের স্থায়ী বা এক রাতের প্রেমিকদের সাথে দেখা করতে চাইতো এমন এক জায়গায় যেখানে তারা স্বাধীন আর যেখানে তাদের

শুধুমাত্র মদ্যশালার মেয়ে হিসেবে দেখা হয়না। বিয়েট্রেস সবসময় ভেতরেই ঘুমাতো। তার প্রায় দুষ্প্রাপ্য এক রাতের পোষকেরা খুব বেশি খরচ করতে চাইত না। এক রাত এমন এসেছিলো যখন মালিক ন্যাগুথির কাছে পাত্তা না পেয়ে তার কাছে এসেছিলো। সে শুরু করলো তার কাজের ভুল ধরা দিয়ে ; তারপর তাকে গালি দিতে লাগলো, তারপর হঠাৎই তার প্রশংসা করতে লাগলো, অবশ্য যদিও এক বিরক্তিকর অবজ্ঞাসূচক ভঙ্গিতে। সে তাকে টেনে ধরলো, যেন কুস্তি করতে লাগলো, ভুড়িওয়ালা পেট, ধূসর চুল, আর বাকিসব। বিয়েট্রেসের লোকটার সম্পর্কে ধারণায় আচমকাই পরিবর্তন এলো। এই কিছু সময় আগেই ন্যাগুথির সরিয়ে দেয়া জিনিসকে কিছুতেই সে কাছে টেনে নেবেনা, নিতে পারবেনা। হে ঈশ্বর! সে ভেতরে ভেতরে বিলাপ করলো, ন্যাগুথির এমন কি আছে যা আমার নেই! লোকটি এবার নিজেকে তার সামনে অপমানিত করলো। সে মিনতি করলো, তাকে উপহারের প্রতিশ্রুতি দিলো। কিন্তু সে নিজেকে সমর্পন করলোনা। সেই রাতে সে নিজেই নিয়ম ভাঙলো। সে একটা জানালা দিয়ে লাফিয়ে পালালো; আরেকটা মদ্যশালায় গিয়ে বিছানা পাতলো আর ফিরে এলো সেই সকাল ছয়টায়। মালিক সবার সামনে তাকে ডাকলো আর তাকে চাকরি থেকে বার করে দিলো। কিন্তু বিয়েট্রেস বরং নিজের কর্মকাণ্ডে অবাকই হলো।

একমাস সে কোনো চাকরি ছাড়াই কাটালো। সে অন্যান্য মেয়েদের খামখেয়ালি দয়ার ওপর নির্ভর করে একেকদিন একেকজনের কামরায় দিন কাটাতে লাগলো। ইলমোরগ ছেড়ে অন্য শহরে গিয়ে আবার নতুন করে সব শুরু করবার মত মনের অবস্থা তার ছিলোনা। ক্ষতে জ্বালা ধরে গিয়েছিলো। সে জায়গা বদলাতে বদলাতে ক্লান্ত। সে আম্বি ব্যবহার করাও বন্ধ করে দিলো। টাকা নেই। সে নিজেকে আয়নায় দেখলো। তাকে কেমন বয়স্ক লাগছে, টেনেটুনে এক বছর হয়ত হয়েছে তার ঈশ্বরের কৃপাবঞ্চিত জীবনের। তখন সে কেন অমন খুঁতখুঁতে ছিলো, সে নিজেকে জিজ্ঞেস করে। কিন্তু যেভাবেই হোক, তার একটা ভয় ছিলো উপযাচক হয়ে প্রেমিক আকর্ষণ অথবা সরাসরি নিজের শরীর দেখিয়ে টাকা উপায়ের ব্যাপারে। সে চাইত কেবল একটা ভদ্রগোছের কাজ আর এক বা একাধিক পুরুষ যারা তার সত্যিকারের পরোয়া করবে। হয়ত তার আসল প্রয়োজন ছিলো একজন পুরুষ, একটা ঘর আর একটা শিশু, তার পাশে, তার বিছানায়। হয়ত এই প্রত্যাশাই ছিলো সেই ভয় যা মদ্যশালার নারীদের থেকে অন্যকিছু চাওয়া পুরুষদের তাড়িয়ে দিত। সে রাতের গভীরে কাঁদত আর বাড়ির কথা মনে করত। এসব সময়ে তার মায়ের বাড়ি নায়েরি তার কাছে ঈশ্বরের সৃষ্ট সবচেয়ে সুন্দর জায়গা বলে মনে হত। সে তার গ্রাম্য বাবা মায়ের জীবন অমিত সুখ সঙ্গতির রোমাঞ্চকর কল্পনায় ভরিয়ে দিতে চাইতো। তার মনে প্রবল ইচ্ছা জাগত বাড়ি ফিরে গিয়ে তাদের দেখে আসতে। কিন্তু সে খালি হাতে কিভাবে ফিরে যেতে পারে? যাই হোকনা কেন, ওই জায়গাটা এখন তার স্মৃতিতে এক দূরবর্তী দিগন্ত ছাড়া আর কিছু নয়। তার জীবন ছিলো এখানে, এই সাথীহারা অপরিচিত ভীড়ের মাঝে। ঈশ্বরের কৃপা থেকে পতিত, চরমভাবে। সে ওই প্রজন্মের অংশ ছিলো যারা কখনোই ঠিক মাটি, শষ্য, বাতাস কিংবা

চাঁদের হয়ে উঠতে পারেনি। তার মনে পড়ে তার গ্রামের সেই মেয়েটির কথা, যার কিনা একটা বেশ চাকচিক্যের জীবন ছিলো, একের পর এক ধনী পুরুষ লিমুরুতে তাকে রক্ষিতা করে রাখত, যে কিনা পরে আত্মহত্যা করেছিলো। এই প্রজন্ম মৃত্যুর রহস্যময় জগতের ব্যাপারে দ্বিধাহীন, একইভাবে জীবনের মায়ার ব্যাপারেও অনুভূতিশুন্য ; যেমন কয়জন অবিবাহিত মা আছে যারা জীবনের সেই চাকচিক্য হারানোর বদলে বাচ্চা ল্যাট্রিনে ছুড়ে দেয়াকে বেছে নেবে? মেয়েটার মৃত্যু হাস্যরসে পরিণত হয়েছিলো। মেয়েটার মোক্ষলাভ হয়েছে - কোনো কষ্ট ছাড়াই, সবাই বললো। তারপর, প্রায় এক সপ্তাহের জন্য, বিয়েট্রেসও একই কাজ করার কথা ভাবলো। কিন্তু সে সাহস সঞ্চয় করতে পারলোনা।

তার ভালোবাসা প্রয়োজন ছিলো, জীবনের প্রতিও লোভ ছিলো।

ইলমোরগে একটা নতুন মদ্যশালা খোলা হলো। ট্রিটপ মদ্যশালা, সরাইখানা ও রেস্তোরাঁ। ট্রিটপ নামের কারণ বিয়েট্রেস বুঝলোনা, কারণ পুরোটাই ছিলো ইটকাঠের ভবনঃ নিচতলায় চায়ের দোকান, আর একদম ওপরে মদের দোকান। আর মাঝখানে সব ঘর ছিলো পাঁচ মিনিট থেকে একদিন অব্দি থাকার জন্য সরাইখানা। মালিক ছিলো একজন অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী যে কিনা এখনও রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিলো। লোকটি ছিলো বিরাট ধনী, কেনিয়ার প্রত্যেকটি বড় শহরে তার ব্যবসা প্রসারিত ছিলো। সারা দেশ থেকে বড় বড় হোমরাচোমরারা তার কাছে আসতো, বেশিরভাগ সময়ই রাজনীতির কথা হত আর তাদের কাজের কথা। তারা তর্ক করত, ঝগড়া করত, মাঝেমধ্যে হাতাহাতিও লেগে যেত। কিছু প্রসঙ্গেই তারা একমত হত, যেমন লুও সম্প্রদায় কেনিয়ার সব সমস্যার মূল; বুদ্ধিজীবী আর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীরা সুবিধার স্বর্ণশিখরে বাস করে; উন্নয়নে কিয়াম্বুর অংশ সিংহভাগের চেয়েও বেশি; নায়েরি আর মুরুঙ্গা থেকে আসা লোকেরা নাইরোবির সব বড় ব্যবসা দখল করে নিলো আর ওরা চিরি জেলার দিকেও এগিয়ে আসছে; আর আফ্রিকান মজুর, বিশেষত কৃষকগুলো, হিংসায় মরে যাচ্ছে 'তাদের' দেখে কারণ তারা প্রভূত উন্নতি করেছে। অথবা তারা নিজেদের প্রশংসা প্রতিপ্রশংসায় ব্যস্ত থাকত। মাঝেমধ্যে তো মদ্যপ অবস্থায় প্রশংসার বানে ভেসে মদ্যশালার সবাইকে দুটো করে বিয়ার দান করত, ইলমোরগের গরীব লোকেরাও সেই আশায় ট্রিটপের ফটকের সামনে এসে বসে থাকতো।

এখানে বিয়েট্রেস চাকরি পেলো একজন পরিচ্ছন্নতাকর্মী আর ঘর গোছানোর লোক হিসেবে। কিছুদিন তার বেশ ভালোই বোধ হলো। এখানে সে সেসব লোকেদের ঘর গোছাতো যাদের এতদিন সে শুধু নামই শুনেছে। কিন্তু শীঘ্রই তার কপাল ঘুচে গেলো। অন্যান্য মদ্যশালা থেকে মেয়েরা ট্রিটপে চলে এলো, যাদের সে লিমুরুতে দেখেছে, ইলমোরগে দেখেছে। আর বেশিরভাগই বিভিন্ন ধনী লোকেদের সাথে নিজেদের জড়িয়ে ফেললো। আর ন্যাগুথিকেও দেখা

গেলো, কাউন্টারের পেছনে নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে ধনী গরীব সবার নজর কেড়ে নিয়ে বসে আছে। এদের উপস্থিতিতে বিয়েট্রেসের মত পরিচ্ছন্নতাকর্মী আরও অদৃশ্য হয়ে উঠলো। ভাগ্য জয় করা মেয়েগুলো তাকে পাত্তাই দিলোনা।

সে স্বপ্নমাখা চোখে জীবন নিয়ে যুদ্ধ করছিলো। সে স্বপ্ন দেখত প্রেমিকের যারা স্রেফ দুজনের জন্য তৈরি মার্সেডিজ গাড়িতে চড়ে আসবে। সে নিজেকে কল্পনা করে এমন এক প্রেমিকের হাত ধরে সে যাচ্ছে, নাইরোবি আর মোম্বাসার রাস্তা ধরে, উঁচু জুতোয় টপটপ শব্দ তুলে, জোরে কিন্তু ছোট পদক্ষেপে। সে আর কখনোই তখন ছেড়া পোশাক সেলাই করবেনা। সে হবে বিভিন্ন রকমের পরচুলার গর্বিত মালকিন। তাহলেই না, সমস্ত দুনিয়া এই এক বিয়েট্রেসের নামে জয়ধ্বনি দেবে। তখন সে আর সামান্য পরিচ্ছন্নতাকর্মী থাকবেনা, পাঁচ মিনিটের রাসলীলার জন্য বিছানা তৈরি করবেনা। তখন সে হবে সেই বিয়েট্রেস, ওয়াংগু মাকেরির উত্তরসূরী যে কিনা চাঁদের আলোয় নগ্ন শরীর দেখিয়ে তার প্রেমিকদের কামে অচেতন করে ফেলত, ন্যাঙ'এনডোর মেয়ে যে কিনা আধুনিক ইলমোরগের রূপকার, যার কথা এখনও কিংবদন্তি যে সে তার বেশ কিছু প্রেমিকদের কাম তাড়নায় নপুংসকে পরিনত করেছিলো।

তারপর একদিন সে তাকে দেখলো, তার স্বপ্নের প্রেমিকের একদম বিপরীত। সে এক শনিবারে এলো একটা বিরাট পাঁচটনি ট্রাক চালিয়ে। সে খুব সাবধানে দামী গাড়িগুলোর পাশে ওটাকে থামালো, একটা ট্রাক হিসেবে না, যেন ওটাও কোনো বেশ দামী কোম্পানির গাড়ি। তার গায়ে ছিলো একটা ধূসর স্যুট আর তার উপরে একটা মিলিটারি খাকি ওভারকোট। সে ওভারকোটটা খুলে সামনের সিটে রাখলো, বেরিয়ে ট্রাকের দরজা বন্ধ করলো আর ট্রাকটার চারপাশে ঘুরে ঘুরে দেখলো যে কোথাও কোনো ক্ষয়ক্ষতির চিহ্ন আছে কিনা। ট্রিটপে ঢোকার শেষ মূহুর্তেও সে ঘুরে একবার দেখে নিলো যে তার ট্রাক জায়গামতো ঠিক আছে কিনা। সে এক কোণায় বসে কেনিয়ার দেশী মদ অর্ডার দিয়ে পরিচিত মুখ খুঁজতে লাগলো। সে এক বেশ নামডাকওয়ালা লোককে চিনতে পারলো আর চট করে তার জন্য এক বোটল ভ্যাট ৬৯ মদের অর্ডার দিলো। লোকটি মাথা নাড়িয়ে একটা আস্কারামূলক হাসির মাধ্যমে মদটা গ্রহণ করলো, কিন্তু তার সাথে কথা এগোতে গিয়ে ট্রাকওয়ালা বিশেষ পাত্তা পেলোনা। সে বিব্রত হলো, একটু দমে গেলো, কিন্তু শুধু একটু ক্ষণের জন্যই। সে আবার চেষ্টা করলো, কিন্তু বদলে তাচ্ছিল্যই পেলো। হাসিতামাশার ক্ষেত্রে তো সে আরও বাজেভাবে ব্যর্থ হলো। সে একাই জোরে জোরে হাসতে লাগলো আর বাকি সবাই চুপ করে গেলো। সেই সন্ধ্যায় কিছু পরে সে উঠলো, কিছু কড়কড়ে একশ শিলিংয়ের নোট গুনে কাউন্টারে ন্যাগুথির কাছে রাখতে দিলো। লোকেরা ফিসফিস শুরু করলো, কেউ ব্যঙ্গের হাসি হাসলো, কিন্তু সত্যি বলতে তারা প্রভাবিত হয়েছিলো। কিন্তু এই ব্যাপারটা তাকে সাথে সাথেই আলোচনায় নিয়ে আসেনি। সে ঝিমুতে ঝিমুতে ভাড়া নেয়া ৭ নং ঘরের দিকে চললো। বিয়েট্রেস তার জন্য চাবি নিয়ে এলো, সে

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তাকে দেখলো, তারপর সব উৎসাহ হারিয়ে ফেললো।

তারপর থেকে সে প্রতি শনিবারেই আসতে শুরু করলো। সে আসত, কোণায় বসত, আর ৭ নং ঘরটা ভাড়া নিত। বিয়েট্রেস নিজের অজান্তেই তার আসার জন্য অপেক্ষা করত আর ঘরটা গুছিয়ে রাখতো। প্রায়ই বড়লোকদের কাছে বাজেভাবে অপমানিত হবার পর সে বিয়েট্রেসের সাথে কথা বলত অথবা বলা চলে বিয়েট্রেসকে সামনে রেখে নিজের সাথেই কথা বলত। তার জীবনটা ছিলো সংগ্রামের। শিক্ষার ব্যাপারে উচ্চাশা থাকা সত্ত্বেও সে কোনোদিন স্কুলে যেতে পারেনি, সুযোগই পায়নি। তার বাবা রিফট ভ্যালিতে ইউরোপীয় দখলদারদের হয়ে জমি দখলের কাজ করত। ঔপনিবেশিক দিনগুলোতে সেটা অনেক বড় ব্যাপার ছিলো। ব্যাপার এই ছিলো যে যারা ওই কাজ করে তাদের আর তাদের সন্তানদের জীবন ধ্বংস হয়ে যায় ওই সাদা কুত্তা আর ওদের সন্তানদের জন্য খাটতে খাটতে। সে বিদ্রোহ করেছিলো, সংশোধনাগারে গিয়েছিলো, সেখান থেকে ফিরে এসেছিলো একেবারে অন্যরকম হয়ে। হওয়ার মধ্যে হলো এই যে বড় চাকরি করার মত কোনো শিক্ষাই সে লাভ করতে পারলোনা। সে কয়লার কাজ থেকে শুরু করলো, তারপর কসাইয়ের কাজ, তারপর পদে পদে কাজ করতে করতে এখন সে রিফট ভ্যালি থেকে চিরি জেলা হয়ে নাইরোবিতে সবজি আর আলু নিয়ে যাওয়ার একজন বড় পরিবহন মালিক। সে তার সাফল্যে বেশ গর্বিত ছিলো। সে সেসব পুরনো দিনের কথা বলত, পড়াশোনা করতে পারলে কি হত তা বলত, তার সন্তানদের শিক্ষার জন্য ভালো বন্দোবস্ত করার কথাও বলত। তারপর সন্তর্পণে তার টাকাগুলোকে গুণে বালিশের তলায় রাখত, তারপর বিয়েট্রেসকে বিদায় করে দিত। কখনো কখনো তাকে একটা বিয়ার কিনে দিত, কিন্তু পয়সালোভী হিসেবে চেনা মেয়েদের সে বেশ সন্দেহের চোখেই দেখে। অবশ্য তার কারণ তার এখনো বিয়ে হয়নি।

একরাতে সে বিয়েট্রেসের সাথেই ঘুমালো। সকালে উঠে সে তাকে একটা চকচকে বিশ শিলিংয়ের নোট ধরিয়ে দিলো। বিয়েট্রেস একটু ইতস্তত করে টাকাটা নিলো। বেশ কিছুদিন লোকটা এমনই করলো। বিয়েট্রেসের টাকা নিয়ে সমস্যা ছিলোনা, টাকাটা তার কাজেই লাগত। কিন্তু লোকটা এমনভাবে ওর শরীরের জন্য টাকা দিত যেন কোনো আলুর বস্তার দাম দিচ্ছে। সে তার অহমিকায় বিরক্ত হত, বিরক্ত হত তার একঘেয়ে প্রলাপে। কিন্তু তবু, কিছু একটা যেন ছিলো, একটু আগুন, একটা বীজ, একটা ফুল, গহীনে, জায়গা করে নিচ্ছিলো। সে তার মধ্যে তার মতই এক অসহায় ত্রস্ত হরিণকে খুঁজে পেয়েছিলো যার আশায় পথ চেয়ে বসে থাকা যায়। সে আশা করত এমন একজনের যে তাকে বুঝবে।

আর তারপর সে ওই কাজটা একদিন করলো, কথার মাঝখানে চুপ করিয়ে দিলো। সে জানেনা সে কেন এটা করেছে। হয়ত বাইরের বৃষ্টিটাই কারণ ছিলো।

সে লোকটাকে শোনাতে চাইলো, তাকে শুনতেই হলো। সে কারাতিনা থেকে নায়েরিতে এসেছে। ব্রিটিশ সৈনিকেরা তার দুটো ভাইকে গুলি করে মেরেছে। আরেকজন মারা গেছে আটক অবস্থায়। তার বাবা মা গরীব, সেই হয়ে পড়লো একমাত্র সম্বল। তারা তাদের যৎসামান্য জমি চাষ করে তার পড়াশোনার খরচ যোগাতো। প্রাইমারির প্রথম ছয় বছর সে খুব পরিশ্রম করলো, তারপরের বছর হঠাৎ কি হলো, হয়ত সেই পরিশ্রম কম করেছিলো, তার ফলাফল একটু খারাপ হলো। তারচেয়েও খারাপ ফলাফল নিয়ে ছেলেমেয়েরা বিভিন্ন হাইস্কুলে লোকজন ধরাধরি করে পড়তে চলে গেলো। তার কোনো পরিচিতও ছিলোনা, হারাম্বি স্কুলে দেয়ার মত তার বাবা মায়ের টাকাও ছিলোনা। সে বাড়িতেই রইলো, বাবা মাকে সাহায্য করতে লাগলো। কিন্তু এই ছয় বছরের লক্ষ্য থেকে তার জীবন হঠাৎই যেন এক ভিন্ন খাতে চলে গিয়েছিলো। সে প্রায়ই কারাতিনা থেকে নায়েরি যেত কাজের খোঁজে। কিন্তু সব জায়গায় একই প্রশ্ন, কি জানো তুমি? টাইপরাইট? শর্টহ্যান্ড? সে হতাশ হয়ে পড়লো। এভাবেই একবার নায়েরিতে, সে একটা দোকানে বসে ফান্টা খাচ্ছিলো, চোখে পানি, তার দেখা হলো কালো স্যুট আর সানগ্লাস পরা এক ছেলের সাথে। সে তাকে দেখে এগিয়ে এলো, নাইরোবি থেকে এসেছিলো সে। চাকরি দরকার? সে তো সহজ, বড় শহরে কাজের কোনো অভাব নেই। সে সাহায্য করতে পারবে। গাড়ি? তার গাড়ি ছিলো বৈকি, একটা ঘিরঙা পগেট। সে তাকে টেরেস বারে নিয়ে গেলো। ভ্রমনটা বেশ ভালোই ছিলো। তারা বিয়ার খেলো আর নাইরোবি নিয়ে কথা বললো। জানালা দিয়ে সে নিয়ন আলোর শহর দেখলো আর ভাবলো এখানে আশা আছে। ওইরাতে সে নিজেকে ওই লোকটার কাছে সঁপে দিলো, এক নতুন সকালের আশায়। বেশ একটা গভীর ঘুম হয়েছিলো তার। সকালে উঠে সে আর লোকটিকে দেখতে পেলোনা, কখনোই না। এভাবেই সে একজন মদের দোকানের মেয়ে হিসেবে নিজের জীবন শুরু করেছিলো আর তারপর এই দেড় বছরে সে একবারও বাবা মায়ের কাছে যায়নি। বিয়েট্রেস কাঁদতে শুরু করলো। তার ক্ষতগুলো তাজা ছিলো। এই জীবন তার ভালো লাগেনা, কিন্তু সে আটকে পড়েছে। সে হেঁচকি তুলে কাঁদতে লাগলো। তারপর হঠাৎ শক্ত হয়ে গেলো। তার কান্না হাওয়ায় মিলিয়ে গেলো। লোকটা বহু আগেই নিজেকে কম্বলে ঢেকে নিয়েছে। তার জোরে জোরে নাকডাকা শুনতে ভুল হবার মত নয়।

এক অদ্ভুত শুন্যতা তাকে ঘিরে ধরলো। হা ঈশ্বর! এই কি সে প্রতি শনিবারে যার দুঃখের গল্প আমি শুনে বেড়াই? এই কি সে যাকে আমি আমার সমব্যথী ভেবেছি? অবশ্য সে তার সেবা টাকা দিয়ে কিনেছে, তার বিলাপ ওই লোকটির ঘুমপাড়ানি গান হয়েছে। হঠাৎই কিছু একটা তার মধ্যে জ্বলে উঠলো। এই দেড় বছরের সমস্ত রাগ, অপমান, তিক্ততা এই লোকটির উপর কেন্দ্রীভূত হলো।

তারপর সে যা করলো তা করতে বেশ পাকা হাতের দরকার হয়।

বিয়েট্রেস লোকটার চোখ স্পর্শ করলো, গভীর ঘুমন্ত চোখ। তারপর সে তার মাথাটা তুলে ধরলো, তারপর পড়ে যেতে দিলো। তার চোখগুলোতে এখন পাষাণ তীব্রতা। মাথার নিচ থেকে বালিশ সরিয়ে সে তার টাকা বের করে আনলো। গোলাপি নোটগুলো গুনে সে তার কাঁচুলির ফাঁকে লুকিয়ে রাখলো।

সে ৭ নং ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। বাইরে তখনো বৃষ্টি হচ্ছিলো। তার নিজের সরু ঘরটায় ফিরে যেতে ইচ্ছে করছিলোনা। মাটিকাদা বৃষ্টি পেরিয়ে সে চলছিলো ন্যাগুথির ঘরের দিকে। সে দরজায় ধাক্কা দিলো, প্রথমে চুপচাপ, তারপর ন্যাগুথির ঘুমজড়ানো কণ্ঠ শোনা গেলো।

- কে?

- আমি, একটু খোলো।

- কে?

- বিয়েট্রেস

- এত রাতে?

- খোলো, দয়া করে।

আলো জ্বলে উঠলো। দরজা খুলে গেলো। ন্যাগুথির গায়ে একটা স্বচ্ছ রাতপোশাক, গলায় উদ্বেগ।

- কিছু হয়েছে বিয়েট্রেস?

- আমি কি কিছুক্ষণ বসতে পারি? আমি ক্লান্ত, আর তোমার সাথে কথাও বলতে চাচ্ছিলাম।

- কিন্তু কি হয়েছে?

- আমি শুধু একটা প্রশ্ন করতে চাই ন্যাগুথি!

তারা দুজনেই তখনো দাঁড়িয়েই ছিলো, এই পর্যায়ে দুজনেই বিছানায় বসলো।

- তুমি বাড়ি কেন ছেড়েছিলে ন্যাগুথি?

কিছু নিস্তব্ধ মুহূর্ত কাটলো। বিয়েট্রেস উত্তরের অপেক্ষায় বসে রইলো। কিছুক্ষণ পর যখন ন্যাগুথির গলা শোনা গেলো সেটা বেশ অস্থির শোনাচ্ছিলো।

- এটা বেশ লম্বা কাহিনি, বিয়েট্রেস। আমার বাবা মা বেশ ধনী ছিলো। তারা বেশ ধার্মিকও ছিলো। আমরা বেশ শৃঙ্খলার মধ্যেই জীবনযাপন করতাম।নাস্তিকদের সাথে হাটবেনা, মূর্তি পূজারিদের সাথে মিশবেনা, এই সেই। কখন কিভাবে কি খেতে হবে, এমনকি তার জন্যও নিয়মকানুন ছিলো। ধার্মিক মেয়েদের মত হাটতে হবে, ছেলেদের সাথে যেন কখনোই আমাকে দেখা না যায়। নিয়ম আর নিয়ম। একদিন স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার বদলে আমি আর আমার মতই আরেকটা মেয়ে ইস্টলেঘ থেকে পালিয়ে আসি। সেই থেকে এই পর্যন্ত, চার বছর হয়ে গেলো আমি বাড়ি যাইনি। এইত!"

তারপর আবার স্তব্ধতা, তারপর তারা একজন আরেকজনের দিকে পরিচিত ভঙ্গিতে তাকালো।

- আরেকটা প্রশ্ন ন্যাগুথি, আমার সবসময় মনে হত তুমি আমায় ঘৃণা করো, আমাকে এড়িয়ে চলো।

- না না বিয়েট্রেস। ঘৃণা নয়। আসলে কোনোকিছুই আমাকে আর আগের মত টানেনা, এমনকি পুরুষমানুষও নয়। সবকিছু খুব একঘেয়ে হয়ে উঠেছে। হ্যা, আমি চাই, আমার ওই ক্ষণিকের উত্তেজনাটুকু দরকার, ওই মিথ্যে মন রাখার জন্য বলা মিষ্টি কথাগুলো দরকার। কিন্তু তুমি, তুমি এসবের অনেক উপরে, তোমার ভিতরে তুমি এমন কিছু ধারণ করে আছ, যা আমি পারিনা।

বিয়েট্রেসের কষ্ট হলো চোখের পানি ধরে রাখতে।

পরেরদিন খুব ভোরে সে নাইরোবিগামী একটা বাসে উঠে বসলো। সে বাজারের মধ্যের পথ দিয়ে হেটে গেলো দোকান দেখতে দেখতে। তারপর সরকারি রাস্তায়, কেনইয়াট্টা এভিনিউতে। হোসেন সোলেমানি সড়কের এক দোকান থেকে সে বেশ কয়েক জোড়া মোজা কিনলো আর একজোড়া পরেও নিলো। তারপর একটা নতুন জামা কিনে সে সেটাও পরে নিলো। তারপর কাছেই একটা বাটার দোকানে গিয়ে একজোড়া উঁচু হিল জুতা কিনে পরে নিয়ে তার পুরনো জুতা ফেলে দিলো। তারপর সে কিনলো নতুন কানের দুল। একটা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সে তার নতুন রূপ দেখে নিলো। হঠাৎই তার একটা ক্ষুধাবোধ হচ্ছিলো, যেন আজকের দিনটার জন্য সে তার পুরোটা জীবন ক্ষুধার্ত ছিলো। মোতি মহলে ঢুকতে সে একটু ইতস্তত করলো, তারপর হেটে এগিয়ে গিয়ে ঢুকলো ফ্রান্সেই তে। তার চোখে এখন সেই চমক ছিলো যেটা পুরুষদের তার দিকে আকৃষ্ট করছিলো। সে শিহরিত হলো। একটা কোণার দিকের টেবিলে বসে সে ভারতীয় তরকারির হুকুম দিলো। একটা লোক নিজের টেবিল ছেড়ে তার সাথে যোগ

দিলো। সে তার দিকে তাকিয়ে দেখলো, জ্বলজ্বলে চোখ, কালো স্যুট পরা সেই লোকটার চোখে ভেসে উঠেছে কামনা। লোকটি তাকে একটা মদ কিনে দিলো, তার সাথে ভাব জমাতে চাইলো, কিন্তু সে চুপচাপ খেয়েই গেলো। লোকটি টেবিলের নিচ দিয়ে হাত এগিয়ে তার হাঁটু ছুঁয়ে দিলো, সে কিছুই বললো না। তারপর আরেকটু এগিয়ে লোকটি তার জঙ্ঘায় হাত রাখলো, তখন সে হঠাৎ তার আধখাওয়া খাবার এবং একদম না ছোঁয়া মদ ফেলে রেখে উঠে চলে যেতে লাগলো। তার বেশ ভালো লাগছিলো। লোকটি তার পেছন পেছন এলো। সে না তাকিয়েও বুঝতে পারছিলো। কিছুটা পথ লোকটি তার পাশে পাশে চললো, সে নিজের মনে হাসলো কিন্তু ফিরেও তাকালো না। লোকটি মনোবলই হারিয়ে ফেললো, এক হতাশ দৃষ্টি নিয়ে কাচের ওপার থেকে দেখলো তার চলে যাওয়া। ইলমোরগ যাবার বাসে লোকেরা তাকে দেখে জায়গা ছেড়ে দিতে লাগলো, সে এসব উপভোগ করলো অধিকারের মত করে। ট্রিটপে পৌঁছে সে সোজা কাউন্টারে চলে গেলো। বড় বড় মানুষের স্বাভাবিক ভিড়টা তখন সেখানেই ছিলো, তার আগমনে তারা কিছুক্ষণের জন্য চুপ হয়ে গেলো। তাদের কামাতুর চোখ তার দিকেই নিবদ্ধ রইলো। এমনকি ন্যাগুথিও তার উদাস ভাবটা বজায় রাখতে পারলোনা। ম্যানেজার তার কাছে দৌড়ে এলো, কথা জমানোর চেষ্টা করলো। সে কাজ কেন ছেড়ে দিলো? সে কোথায় ছিলো? সে কি এখনও কাজ করতে আগ্রহী কিনা, সে চাইলে ন্যাগুথিকে কাউন্টারের কাজেও সাহায্য করতে পারে? এক পরিবেশক তাকে একটা চিরকুট এনে দিলো। বেশ পরিচিত বড় মানুষদের একজন তাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে তাদের টেবিলে গিয়ে বসতে। এমন আরও কিছু চিরকুট এলো, রাতে কি তার অবসর হবে? একটা নাইরোবি যাওয়ার প্রস্তাবও এলো। সে কাউন্টার ছেড়ে নড়লোনা, কিন্তু সে তাদের দেয়া মদগুলো গ্রহণ করলো, অধিকার হিসেবে। সে এক নতুন শক্তি অনুভব করলো, এক নতুন আত্মবিশ্বাসও

সে একটা শিলিং বের করে গানের বাক্সের গর্তে ফেললো আর বাক্সটা ধুম করে বেজে উঠলো রবিনসন মোয়াংগির হুনউ ওয়া মাসাম্বানি গানে। তারপর সে একটা কামারু আর ডিকে গান বাজালো। লোকগুলো তার সাথে নাচতে চাইছিলো। সে তাদের উপেক্ষা করছিলো, কিন্তু একইসাথে তাদের তোষামোদ উপভোগও করছিলো। সে আরেকটা ডিকে গানের তালে পাছা দোলাতে লাগলো। তার শরীর ছিলো স্বাধীন। সে বাতাসে মিশে থাকা উত্তেজনা আর দ্বিধা শুষে নিতে লাগলো।

তারপর হঠাৎই ছয়টার দিকে ট্রাকওয়ালা লোকটা হন্তদন্ত হয়ে বারে এসে ঢুকলো। তার গায়ে ছিলো তার মিলিটারি ওভারকোট। তার পেছনে ছিলো পুলিশের লোক। সে চারিদিকে তাকালো। বারের সবাই জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে লোকটির দিকে তাকিয়ে ছিলো। কিন্তু বিয়েট্রেস পাছা দোলানোতেই মগ্ন ছিলো। প্রথমে সে গানের বাক্সের পাশে বৈভবের কিছু মুহূর্ত উদযাপনে নাচতে থাকা বিয়েট্রেসকে চিনতেই পারেনি। তারপর সে যেন জয়ের আনন্দে চিৎকার করে উঠলো, "এইত

সেই! চোর চোর!"

লোকজন সব নিজেদের আসনে এলিয়ে পড়লো। পুলিশ গিয়ে তাকে হাতকড়া লাগিয়ে দিলো। সে বাঁধা দিলোনা। কেবল দরজা অব্দি গিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে সবার উদ্দেশ্যে সে একদলা থুতু ফেললো। তারপর পুলিশের সঙ্গে চলে গেলো।

বারের মধ্যকার স্তব্ধতা হাসির শব্দে খানখান হয়ে গেলো যখন কেউ একজন এটাকে কৌতুক করে মারকাটহীন মিষ্টি ডাকাতি বললো। তারা তার সম্পর্কে আলোচনা করলো। কেউ বললো তাকে মার দেয়া উচিত ছিলো। আর বাকিরা সার্বিকভাবে 'এসব বারের মেয়েরা' নিয়ে বললো। কিছু লোক আবার মাথা নেড়ে নেড়ে অপরাধের হার বেড়ে যাওয়া নিয়ে শংকা প্রকাশ করলো। ফাঁসির আইনটা সবধরনের চুরি ডাকাতির ক্ষেত্রেই দেয়া উচিত, নয় কি? আর সবার অজান্তেই ট্রাকের মালিক যেন নায়ক বনে গেলো। তারা তাকে ঘিরে ধরলো আর পুরো ঘটনা শুনতে চাইলো। কেউ আবার তাকে মদও কিনে দিলো। তারচেয়েও বড় ব্যাপার, তারা শুনছিলো, মন দিয়ে শুনছিলো, মাঝেমধ্যে তাদের মনোযোগী স্তব্ধতা হাসিতে ফেটে পড়ছিলো। আর সেই লোকটি, প্রথমবার যাকে এভাবে গ্রহণ করা হয়েছে, রসিয়ে রসিয়ে গল্পটা বলে যেতে লাগলো।

কেবল কাউন্টারের পেছনে ন্যাগুথি কাঁদলো।

সোনিয়া হোপ এর গল্প

দ্যা কেট

অনুবাদ: লুনা রাহনুমা

১৯৬৪: যে বছর তার বিবাহিত জীবন সমাপ্ত হয়েছিল। যে বছর তার রেকর্ড ঘুর্ণন বন্ধ হয়েছিল, রেকর্ড যন্ত্রের খাঁজে আটকে থাকা সূঁচটি আলগোছে উঠিয়ে নেয়া হয়েছিল, এবং একটি ছোট্ট স্ন্যাপের সাথে তার স্বরের হাতলটিকে জায়গা মতো তুলে রাখা হয়েছিল।

তিনি কখনই মেরিলিনকে চাননি। চাননি তার মুখের উপর যত্ন করে বসিয়ে রাখা প্রিম-গার্ল চুলের ভাঁজ। চাননি মেরিলিনের পূর্ণিমার মতো উজ্জ্বল মুখটি তার নিজের মুখের এতটাই কাছে, যে সেই মুখটি তার কাছে দারুন রকম বিরক্ত লাগতো। তিনি মেরিলিনের মুখে আর শুনতে চাননি সেই কথাগুলো, আমার এখন আট সপ্তাহ হয়ে গিয়েছে, আমাদের বিয়ে করতে হবে। কথাগুলো বলতে বলতে মেরিলিনের মুখের কোণা কুঁকড়ে যেত বিরক্তিতে। তিনি হ্যাকনি টাউন হলের অনুষ্ঠানটি করতে চাননি, যেখানে রেজিস্ট্রি অফিসের খাতায় আছে

মেরিলিনের স্বাক্ষর এবং তার নিজের স্বাক্ষর (তবে তিনি টনিক মোহায়ের স্যুটটি চেয়েছিলেন যেটি পরে তাকে রাজপুত্রের মতো দেখাচ্ছিল)। তিনি দোকানের উপরে ভাড়া করা এক কামরার ঘরে থাকতে চাননি, যখন মেরিলিন জিজ্ঞাসা করেছিল, তাহলে বাচ্চাটি কোথায় ঘুমাবে? তিনি এসবের কিছুই চাননি। তিনি ইংল্যান্ডে এসেছিলেন একটি কাজ পেতে, নিজের জীবনে ভালো কিছু করতে, তার অনিন্দ্য সুন্দর দেশ জামাইকায় অপেক্ষা করে থাকা দাদীর কাছে কিছু ছবি তুলে পাঠাতে, যে ছবিগুলো তার দাদিকে গর্বিত করতো। প্রিয় দাদিমা, আমি আশা করি যখন এই কয়েকটি লাইন আপনার কাছে পৌঁছেছে তখন তারা আপনাকে ভীষণ আনন্দিত করেছে...

আপনি ভাবেন, সপ্তাহে ৪০ ঘন্টা কাজ করে ঝক্কর ঝক্কর করে টিমা তালে টটেনহাম থেকে ভিক্টোরিয়া যাওয়ার পথে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থেকে এবং আবার ফিরে এসে, টিকিট মেশিনের হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে প্যাসেঞ্জারদের জন্য টিকিট বের করে আনা, এবং টিকিটের মূল্য হিসেবে ইংলিশগুলোর তার হাতে পয়সা ড্রপ করে দেয়া, কারণ তারা তার ত্বক স্পর্শ করতে চায় না, তিনি নিজের উপার্জিত সেই অর্থের কিছুটা নিজের জন্য ব্যয় করার অধিকার রাখে। কাজের শেষে ঘোড়া দৌড়ের খেলায় নিজের আনন্দকে প্রশয় দেয়ার অধিকার রাখে। ব্রুস গ্রোভের কাছাকাছি রুবেন থেকে একটি নতুন শার্ট, কয়েক জোড়া স্মার্ট জুতো কেনার অধিকার তার আছে। স্টামফোর্ড হিলের দিকে আরএন্ডবি রেকর্ডের দোকানে ঘুরে জাজ এবং ব্লুবিট কাটের নতুন কপি এসেছে কিনা দেখে আসা। আপনারা নিশ্চয়ই বলবেন যে, এগুলো কাজ করা তার জন্য ঠিক আছে এবং উচিত আছে। ব্যাপারটা এমন নয় যে মেরিলিন একজন গৃহবধূ ছিল এবং তার কোন অর্থ উপার্জন ছিল না। যদিও সে ছিল একজন স্টুডেন্ট নার্স। কিন্তু মেরিলিন বলেছে, ছেলেটির এই কাজগুলো করা ঠিক না, খুব অনুচিত। মেরিলিন জিজ্ঞাসা করেছিল, তুমি কি ঘর ভাড়া দিয়েছ? পানির বিল? ব্যাংকে এখন কত আছে, সেভিংস অ্যাকাউন্টে? তুমি দেরি করে বাড়ি ফিরেছো তার মানে তুমি বেটিং শপে গিয়েছিলে? তাই না?

টিম স্পিরিট গর্জন করে উঠে এবং ছেলেটি সেদিন কিছু বোনাস পেয়েছিল। ধনী হবার অনুভূতি তাহলে এমন হয়, সেটি হয় যদি শুধু একদিনের জন্য। সে তার স্থানীয় সমস্ত কর্মচারীদের জন্য পানীয় কিনে উদযাপন করেছিল এই আনন্দ, এবং তারপর সবাইকে রেখে সে আরঅ্যান্ডবি বেটিং শপটি বন্ধ হওয়ার আগেই পৌঁছতে হবে বলে দ্রুত রওনা হয়েছিল। সেদিনের জিতে যাওয়া অর্থের কিছুটা দিয়ে সে দ্যা ক্যাট এর উপর বাজি ধরতে চেয়েছিল এবং ভেবেছিল একবার জিতে গেলেই সবাইকে মিষ্টি কিনে খাওয়ানোর টাকা হয়ে যাবে।

বাড়ি ফেরার পথে সে মেরিলিনের কথা ভেবেছে। মেরিলিনের রান্না করা পুডিং রাইসের কথা ভেবেছে, তার করন্ড বীফ এবং বাঁধাকপির কথা ভেবেছে,

যেখানে সবসময় মসলার অভাব থাকে। মেরিলিন কেমন গোড়ালি ছোঁয়া দৈর্ঘ্যের স্কার্ট পড়তে পছন্দ করে, মোটা ট্যান টাইটস এবং বাদামি রঙের হিল ছাড়া ব্রোগস(জুতো) পরতে পছন্দ করে। মেরিলিন কেমন টেলিভিশন দেখা বা নাচতে যাবার চেয়ে উপন্যাস পড়তে বেশি পছন্দ করে। কেমন করে সে চার্চে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে যখন তার পেট বেরিয়ে এসেছিলো এবং চার্চের সবাই ফিসফিস করে বলতে শুরু করেছিল যে, মাত্র কয়েক মাস হলো বিয়ে হয়েছে অথচ এত তাড়াতাড়ি তার পেট ফুলে উঠেছে কেমন করে? মেরিলিন তার বাবাকে কতটা মিস করে এবং স্পষ্ট করে বলে দিয়েছিল যে তার বাবা, ত্রিনিদাদী যাজকের সাথে তার এই স্বামীটির কোনই তুলনা হয় না। কেমন করে সে কখনই কিছুতেই খুব প্রয়োজন না হলে একটি পয়সাও খরচ করতো না, কারণ সে একটি বাড়ি কেনার জন্য টাকা জমাচ্ছিলো। তাই যত অসুবিধাই হোক না কেন, লন্ডন কাউন্টি কাউন্সিলের দেয়া ছোট্ট একটি ফ্ল্যাটে থাকতে সম্মত না হয়ে কীই বা করতে পারতো মেরিলিন। সেই চাঁদ-মুখটি মনে করে ছেলেটি ভাবছিলো, মেরিলিনকে সমস্ত জীবন ভালো লাগবে, শুধু মেরিলিনকেই ভালোবাসবে এবং বাকিটা জীবন সে তার সাথেই কাটাবে। সেকি সম্ভব?

দ্যা ক্যাট হচ্ছে ইনক্রেডেবল জিমি স্মিথ এর করা একটি এলপি, যেটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট থেকে আমদানি করা, যার দাম ছেলেটির সাপ্তাহিক মজুরির এক-পঞ্চমাংশের সমপরিমাণ। রেকর্ডের প্যাকেটটি ছিল সুস্পষ্ট দৃষ্টিনন্দন লাল রঙের, রেকর্ডের উপরে একটি কালো বিড়ালের ছবি, ছবিতে বিড়ালটি সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। বাড়িতে পৌঁছে তিনি রেকর্ডটিকে রেডিওগ্রামের ভেতর অরিজিন্যাল প্যাকেট সহ লুকিয়ে রাখলো।

মেরিলিন নার্সিং পরীক্ষার জন্য পড়া রিভাইজ করছিলো। ছেলেটি জানতো যে মধ্যবর্তী এই সময়টুকু মেরিলিনের জন্য অত্যন্ত মূল্যবান, কারণ অল্প কিছুদিনের ভেতর তাদের বাচ্চাটা জন্ম নেবে। নার্সিং পরীক্ষার সার্টিফিকেট পাওয়ার আগে সন্তানের জন্ম দেওয়া মানে মেরিলিনের ক্যারিয়ারের শেষ লিখে ফেলা। তাই তিনি নিজের সদ্য কেনা সম্পদটিকে আপাতত গোপন রাখাই উত্তম হবে বলে মনে করেছে। কয়েক সপ্তাহ পর মেরিলিনের পরীক্ষা শেষ হলে দুইজন মিলে দ্যা ক্যাট রেকর্ডটি একসাথে শোনা হবে বলে সিদ্ধান্ত নেন। আপাতত স্মিথের সুরেলা হ্যামন্ড অর্গান সুরগুলো কেনার চিন্তায় বুদ্ হয়ে থাকলো সে। আর বাসটি সেই সময়ে ৭৩ নাম্বার রুটের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যাচ্ছিলো এবং আসছিলো।

দুর্ভাগ্যক্রমে, তিনি ভুলে গিয়েছিলেন যে মেরিলিন ঘর পরিষ্কার রাখার ব্যাপারে কেমন খুঁতখুঁতেস্বভাবের মেয়ে। ধুলাবালি এবং ময়লার দিকে তার তীক্ষ্ণ নজর থাকতো সবসময়। ছোটবেলা থেকেই মেরিলিন ছিলো তার মায়ের সাহায্যকারী, তাই সে জানতো কীভাবে একটা বাড়িকে সম্পূর্ণ পরিষ্কার রাখতে হয়। মেরিলিন

যখন সিলিংয়ের কোণগুলি ধুতো, স্কার্টিং বোর্ডের প্রান্ত থেকে ধুলো ঝাড়তো, জানালার ময়লা মুছতো, তাদের কফি টেবিল, সাদাকালো টেলিভিশনটি মুছতো, ছেলেটি তখন আরাম চেয়ারের স্বাচ্ছন্দ্য বসে থেকে দেখতো শুধু। সেদিন মেরিলিন ব্রাউন টিক রেডিওগ্রামটিকে পালিশ করছিলো, রেডিওগ্রামটি ছিল তাদের জন্য একটা অমিতব্যয়ী ক্রয়, কিন্তু মেরিলিন এটি কিনতে অনুমোদন করেছিলো, কারণ এই ফার্নিচারটি নিজস্ব গুণে যেকোন ঘরের জন্য একটি সম্ভ্রান্ত ফার্নিচার। তাদের বাড়িতে এমন কোনও জায়গা ছিল না যার উপরে ধুলা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারতো। ছেলেটির সত্যিই বোঝা উচিত ছিল যে মেরিলিন খুব শীঘ্রই দ্যা কেট কে পেয়ে যাবে, তখনো সেটি মোড়ানো থাকবে তার স্বপ্ন-মাখা কাগজের ব্যাগে, দেরিতে নয়, আগেই।

তুমি! তুমি অপব্যয়ী! তুমি একটা অপদার্থ, যা-তা। কেমন করে তোমার কাছে আমাদের বাচ্চার চেয়েও গান আর ঘোড়াকে বেশি মূল্যবান মনে হয়? আমাদের নিজের জন্য একটা বাড়ির চেয়েও বেশি মূল্যবান? তুমি জোর করে আমার উপর চাপিয়ে দিয়েছো নিজেকে আর এখন দেখো আমার কী দুর্দশা হয়েছে!

দুঃখজনক ঘটনাটি হলো গিয়ে, এই কথাগুলি বলার সময় মেরিলিন সিঁড়ির ঠিক মাথায় দাঁড়িয়ে ছিল। এবং দুঃখজনক ঘটনাটি হলো যে, কথাগুলো বলার সময় তার চাঁদের মতো মুখটি বিকৃত হয়ে যাচ্ছিলো, তার মুখের রং টমেটোর মতো টকটকে লাল হয়ে গিয়েছিল এবং এই সবগুলো, ছেলেটিকে প্রত্যুত্তর দিতে বাধ্য করেছিল। এবং দুঃখজনক ঘটনাটি হচ্ছে যে এতে ছেলেটির শরীরের রক্ত টগবগ করে ফুটতে শুরু করেছিল এবং ভয়ংকর রাগের সাথে তার হার্ট দ্রুতগতিতে পাম্প করতে শুরু করে। দুঃখজনক ঘটনাটি হলো, ছেলেটি সত্যিকারভাবে একমাত্র যে মহিলাকে ভালোবাসতো, তিনি ছিলেন তার দাদি, সেটি এই মেয়েটি না বা অন্য কোনও মেয়ে নয়। দুঃখজনক কথা যে, তিনি যখন মেরিলিনকে সিঁড়ি থেকে ধাক্কা মেরেছিলেন তখন তিনি শুধু মেরিলিনকে চুপ করাতে চেয়েছিলেন। তিনি চাননি মেরিলিন হাসপাতালে ভর্তি হোক এবং তার নার্সিং পরীক্ষা মিস করুক। তিনি চাননি ছোট্ট একটি সাদা কফিনকে সামনে রেখে শোক আর কান্নায় ভাসানো একটি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন হোক।

এবং যখন তিনি শুক্রবার রাতে কাজ থেকে বাড়ি এসে রান্নাঘরের টেবিলে একটি নোট পেয়েছিলেন, যেখানে লেখা ছিল যে মেরিলিন তার স্বাক্ষর জাল করেছে, তাদের এতোদিনের জমানো সব অর্থ ব্যাংক থেকে তুলে নিয়েছে এবং ত্রিনিদাদের একটি ফ্লাইটের টিকিট কিনে বাড়ি চলে যাচ্ছে, তখন ছেলেটি সমস্ত কিছুর জন্য অনুতপ্ত হয়েছে, কেবলমাত্র মেরিলিন তাকে ছেড়ে চলে যাওয়ার বিষয়টকু ছাড়া।

লেখক পরিচিতি:

জ্যামাইকা ও ত্রিনিদাদিয়ান ঐতিহ্যের মানুষ সোনিয়া হোপ বাস করেন উত্তর-পূর্ব লন্ডনে। তিনি ন্যাশনাল পোর্ট্রেট গাল্যারি এবং ইউনিভার্সিটি অফ লন্ডন অনলাইন লাইব্রেরিতে গ্রন্থাগারিক হিসাবে কাজ করেন। সোনিয়ার লেখা বিভিন্ন সংক্ষিপ্ত কল্পকাহিনী প্রকাশিত হয়েছে দ্য নটিংহ্যাম রিভিউ, ফ্ল্যাশ ফ্লাড, ফ্লাইট জার্নাল, এলিপসিস জাইন, কিং লডস র্যাগ, অ্যাম্বিট, বেস্ট ব্রিটিশ শর্ট স্টোরিজ ২০২০ নাইন্থ জেরউড আরভন অনথলজি, দ্য আনট্যাংলিং এ।

২০১৯/২০-এর কথাসাহিত্য বিভাগে জেরউড/আর্বন শিক্ষার্থী ছিলেন সোনিয়া এবং ২০১৯ সালে তাঁর লেখা দ্যা ক্যাট বাই দ্যা ইনক্রেডিবল জিমি স্মিথ ছোটগল্পটি গার্ডিয়ান ফোর্থ এস্টেট বিএএমই শর্ট স্টোরি পুরস্কারের জন্য শর্ট লিস্টেড হয়েছিল।

বর্তমানে সোনিয়া একটি উপন্যাস এবং আরও স্বল্প-সংক্ষিপ্ত গল্প লিখছেন।

জোহরা সাইয়েদ এর গল্প

সাকিনার চুড়ি

অনুবাদ: রুখসানা কাজল

আমার যখন দশ বছর বয়স তখন সাকিনা নামে আমার সমবয়েসি একজনের সাথে ভীষণ বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। যে সময় সাকিনার সাথে আমার বন্ধুত্ব হয়েছিল সে সময় আমাদের বাসায় ছয়টি মেয়ে ছিল। কারণ তখনও আমার ছোট দুভাইয়ের জন্ম হয়নি। আর সাকিনা ছিল সাত সাতটি উঠতি তরুণ এবং বিবাহিত ভাইদের একমাত্র বোন। ওদের বাড়ি ছিল আমাদের বাড়ির একেবারে পাশে। কিন্তু ওর আব্বু ছিল ভয়ঙ্কর কঠিন মনের মানুষ। সাকিনার বাসার বাইরে খেলতে যাওয়ার খুব বেশি অনুমতি ছিল না। তাছাড়া সাকিনাকে বাড়ির কাজ করতে হত। তাই ওর আব্বু যখন ঘুমিয়ে থাকত ওর আম্মু চুপিচুপি ওকে আমাদের উঠানে খেলতে পাঠিয়ে দিত।

আমাদের দুবাড়ির মাঝখানে একটি শুকনো জলাভূমি ছিল। বছরে মাত্র দুবার জলাভূমিটি পানিতে পরিপূর্ণ হয়ে যেত । তবে সে পানিও ছিল একেবারে অগভীর, খুব সামান্য।

জলাভূমির যে অংশটি সাকিনাদের বাড়ির দেওয়ালের সাথে সংযুক্ত ছিল সেখানে একটি সংকীর্ণ সুড়ঙ্গ মত ছিল। যদিও হামাগুড়ি দিয়ে চলাচলের জন্যে এটা বেশ বড়সড়ই ছিল । আমার বড় বোন এই সুড়ঙ্গটি সাকিনার জন্য আবিস্কার

করেছিল। সাকিনা যখন নিশ্চিত বুঝতে পারত যে ওর আব্বুর নাক ডাকছে মানে ঘুমুচ্ছে, তখন সাথে সাথে হামাগুড়ি দিয়ে ছুটে এসে আমাদের সাথে খেলা করে যেত ।

আমার আব্বুকে ব্যবসার কাজে প্রায়ই ট্যুরে যেতে হত। এ সময় আমাদের কথা ভেবে আব্বুর খুব মন খারাপ হয়ে যেত। আব্বু তাই ঘরে ফেরার সময় তাঁর প্রতিটি সন্তানের জন্য ব্যাগভর্তি করে প্রচুর খেলনা নিয়ে আসতেন। এছাড়া আমাদের খেলাধুলার জন্য আব্বু বাড়ির উঠানে একটি ছোট্ট খেলাঘর বানিয়ে দিয়েছিলেন। চকচকে উজ্জ্বল ছোট ছোট খেলনাপাতি, রান্নাবাটির সেট, পুতুলের জন্যে সুন্দর পানীয় পাত্র এবং লাঠি হাতে ছিন্ন কাপড় পরা পুতুলসহ আরও যে সব খেলনা তিনি নিয়ে আসতেন সেগুলো দিয়ে আমরা ওই খেলাঘরটাকে ভরে ফেলতাম।

গাছের পাতা, বেরি, ঘাস, কাদামাটি দিয়ে আমরা মিথ্যে মিথ্যে খাবার দাবার রান্না করে ডিনার পার্টি করতাম। পুতুলগুলো ছিল আমাদের সন্তানের মত। আমাদের মা যেভাবে সন্তানদের কোলে করে আদর করত আমরা সেভাবে ছোট পুতুলগুলোকে কোলে করে রাখতাম। আমাদের সাতজনের স্বপ্ন জগত আমাদের মত করেই পার হয়ে যেত। একমাত্র সাকিনার আব্বুর কাশির শব্দ আমাদের স্বপ্ন জগতের দেওয়াল ভেদ করে ভেসে আসত। আর সেই শব্দ শুনলেই আমরা সতর্ক হয়ে যেতাম। বুঝতে পারতাম সাকিনার আব্বু ঘুম থেকে জেগে উঠেছে এবং এখুনি সাকিনাকে খুঁজতে শুরু করবে।

সাকিনার হাতের কব্জি থেকে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত সুন্দর সুন্দর চুড়ি এবং নূপুর দিয়ে ভরা ছিল। আমি এবং আমার বোনরা এই সুন্দর চুড়িগুলোর প্রেমে পড়ে গেছিলাম। আমাদের কখনও এরকম চুড়ি বা এমন কিছু পরতে দেওয়া হত না যা প্রচুর শব্দ করে বাজত । এমনকি আব্বুর সামনে আমরা গুনগুন করতে বা গাইতেও পারতাম না। সুতরাং, আমরা ছয়বোনই সাকিনার অসংখ্য ছন্দে বাজা শব্দময় চুড়ি দেখে মুগ্ধ হয়ে থাকতাম যা পরা আমাদের জন্য নিষেধ ছিল। আমরা তখন করতাম কি, নানারকমের লতাপাতা দিয়ে সাকিনার মত হাতে চুড়ি এবং পায়ে নূপুর বানিয়ে পরতাম। বাস্তবে না হোক আমাদের স্বপ্ন কল্পনার জগতে ত আমরা সাকিনার মত চুড়ি আর নূপুর পরতে পারতাম।

একবার আমার আব্বু আম্মু দুজনকেই কি কারণে যেন কয়েকদিনের জন্য বাইরে যেতে হয়েছিল। তখন সাকিনাদের বাসায় আমাদের থাকতে হয়েছিল।

আমার দাদিমা না আসা পর্যন্ত সাকিনার মা আমাকে এবং আমার বোনদের দেখাশুনার জন্য রাজি হয়েছিলেন। এটা ছিল মাত্র দুই দিনের জন্য। প্রথম রাতে ঘুমানোর সময় সাকিনা তার চুড়ি এবং নূপুরগুলো খুলে রেখেছিল। সবাই ঘুমিয়ে পড়লে, অই গয়নাগুলো পরার লোভ আমি কিছুতেই সামলাতে পারছিলাম না।

লজ্জা লজ্জা কুণ্ঠায় আমি ঘুমন্ত সাকিনার মাথার কাছে গিয়ে খুব আস্তে ফিসফিস করে বলেছিলাম, "সাকিনা এ সাকিনা, আমি কি তোর গয়নাগুলো একবার পরতে পারি ? শোন না, মাত্র কিছুক্ষণের জন্য পরব প্লিজ। এই তুই শুনছিস ত সাকিনা !" যদিও আমার ডাকাডাকিতে সাকিনা কোন সাড়া দেয়নি। তার অবশ্য কারণ আছে। আমি এমনভাবে ওকে ডাকছিলাম যাতে ও সম্পূর্ণ সজাগ না হয়ে ওঠে। মনে মনে ভয় ছিল যদি ও গয়নাগুলো পরতে আমাকে না বলে দেয় !

আমার বিবেক সত্য- এমন ভাব দেখিয়েছি আমি। সাকিনার অনুমতি নিতে ওকে ত জিজ্ঞাসা করার চেষ্টা করেছি। ও ঘুমিয়ে থাকলে আমার কি ! তাই এভাবে ওর গয়নাগুলো পরার জন্য আমার কোন অপরাধই হবে না !

ঘরের এক কোণে বসে আমি সাকিনার সমস্ত চুড়ি এবং নূপুরগুলো পরেছিলাম। আমার হাত ও পায়ে খুব সুন্দরভাবে সেগুলো ফিট করে গেছিল। কি যে ভাল লাগছিল ! যদিও ওগুলো খুব ভারী ছিল। কিন্তু আমার ভীষণ ভীষণ আনন্দ হচ্ছিল। যতবার আমি হাত পা নাড়াচাড়া করছিলাম গয়নাগুলো ততবার তীব্র ঝাঝালো ভাবে চিং চিং করে বেজে উঠছিল।

চিং ! চিং ! চিং! আমার ঘুমন্ত বোনদের পাশ দিয়ে আমি হাঁটছিলাম আর আমার হাত পা থেকে গয়নাগুলো বেজে উঠছিল। চিং ! চিং ! চিং !

চিং চিং। চিং ! খুশীতে আমি ইচ্ছে করেই হাঁটাহাঁটি করি। হাত দোলাই। আর গয়নাগুলো নানা শব্দে বেজে বেজে উঠে।

হঠাৎ আমার মনে হল এই শব্দগুলোর খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং গূঢ় গভীর অর্থ রয়েছে। আমি পিছনের দরজার কোণে গিয়ে দাঁড়ালাম এবং সামনে পেছনে আমার হাত দোলালাম। সামান্য কিছুক্ষণের জন্যে একটুখানি আমার পা ঠেকিয়ে রাখলাম। অমনি শুনতে পেলাম হাত পায়ের গয়নাগুলো একসাথে একে অপরের বিরুদ্ধে নানা রকমের শব্দ করে বেজে উঠল। মনে হল আমার শরীরে পরা ঠান্ডা গয়নাগুলো সাথে সাথে গরম হয়ে উঠল।

"চিং! চিং ! চিং!" এরকম বাজনা বাজানো মজার খেলার মধ্যে বুঝতে পারলাম প্রচুর পানি খেয়েছিলাম বলে আমার এখন ওয়াশরুমে যেতে হবে। এমনিতে রাত্তির বেলা একা ওয়াশরুমে যেতে আমি ভয়ঙ্কর রকমের ভীতু ছিলাম। এদিকে আবার লজ্জায় কাউকে ডাকতেও পারছিলাম না। কারণ অনুমতি না নিয়ে সাকিনার গয়না পরেছি বলে বুঝতে পারছিলাম ছোট করে হলেও আমি অপরাধ করে ফেলেছি।

অবশেষে আমি আমার সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করে ভয়ে ভয়ে পিছনের দরজা দিয়ে

একা একা বাইরে বেরিয়ে গিয়েছিলাম।

চিং ! চিং ! চিং ! অশরীরী জ্বীনদের ভয়ে আমি চুড়ি এবং নূপুরে অনেক বেশি বেশি করে শব্দ করতে শুরু করেছিলাম। আমার ধারণা ছিল জ্বিনরা উঠানের খোলা জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছে বা গাছের ডালে ডালে ঝুলে দোল খাচ্ছে।

চিং ! চিং! চিং ! ভয় তাড়াতে এই শব্দের বাজনাগুলো আমাকে সাহস দিচ্ছিল এবং সেই খুশিতে ভুলেই গেছিলাম যে সম্পূর্ণ অন্ধকারে আমি একা ওয়াশরুম খুঁজে বেড়াচ্ছি।

চিং ! চিং ! চিং ! অবশেষে আমিও চলাফেরায় সাকিনার মত শব্দতরঙ্গের আনন্দ পেতে শুরু করেছিলাম।

চিং ! চিং ! চিং ! আচ্ছা সাকিনা কেন এই সুন্দর বাজনাগুলোর শব্দ চেপে রাখতে চেষ্টা করত যখন সে শুনতে পেত যে ওর আব্বু জেগে উঠেছে ? তাছাড়া প্রায়ই মানে মাঝে মাঝেই কেন সে তাদের পাশের দেওয়ালের গায়ে হওয়া ছোট্ট একটি গর্তে এগুলোকে ফেলে দিত?

চিং ! চিং ! চিং ! তবে কি সাকিনা চাইত না আমরা এগুলোর সাথে খেলা করি ?

চিং ! চিং ! চিং ! আচ্ছা নাকি ও ভেবেছিল আমরা ওগুলো ভেঙ্গে ফেলতে পারি ?

চিং ! চিং ! চিং ! রাতের অই নীরবতা ভেঙ্গে হঠাত তিনটি গুলির শব্দ বাতাসে ভেসে এসেছিল। অই সময় আমার মনে হয়েছিল যেন বেহেশত ভেঙ্গে তিন টুকরো হয়ে ঝুলে পড়েছে ! ভয় আর আতঙ্কে ধপাস করে মাটিতে পড়ে গিয়ে সেখানেই আমি নিজেকে ভিজিয়ে ফেলেছিলাম।

ওদিকে সাকিনার আব্বু ছাদের উপর থেকে পস্তু ভাষায় চীৎকার করে বলছিল, সাকিনা তুমি একা কোথায় যাচ্ছ ? এক্ষুনি বাসায় ভেতর চলে এসো। তুমি কেন তোমার আম্মুকে তোমার সাথে আসতে বল নি? কেন ?

গোলাগুলির শব্দ শুনে পুরো বাড়ি জেগে উঠেছিল। এমন বিব্রতকর অবস্থায় আমাকে দেখে আমার সব বোন, সাকিনা, সাকিনার মা এবং অবশ্যই, তার আব্বু আমার অন্যায় কান্ডকারখানা জেনে যাবে যে ! শেষ পর্যন্ত আমি কাঁপা কাঁপা কণ্ঠস্বরে ফার্সি কথ্য ভাষা দারিতে বলতে পেরেছিলাম, “চাচা, আমি শিরিন গুল। আমি কাউকে জাগাতে চাইনি। আমার খুব জরুরি অবস্থা ছিল তাই বাইরে এসেছিলাম।”

"অহ শিরিন গুল ?” সাকিনার আব্বু বিভ্রান্ত হয়ে বলেছিল, “ওহো, আমি

খুবই দুঃখিত। তুমি সাকিনার মত শব্দ করছিলে। রাগে আমি মেজাজ হারিয়ে ফেলেছিলাম কারণ সাকিনাকে অন্ধকারে একা ঘর থেকে বের হওয়ার পার্মিশন দেওয়া হয়নি। তোমারও উচিত ছিল তোমার কোন এক বোনকে জাগিয়ে তোমার সাথে নেওয়া। "

আমার এমন বিভ্রান্ত ভয়ার্ত চেহারা প্রথমে সাকিনা এবং ওর মার চোখে ধরা পড়েছিল। ওরা হাসতে শুরু করেছিল। প্রথম দিকে হতবাক হয়ে যাওয়া আমার বোনেরাও ওদের হাসিতে যোগ দিয়ে মজা পাচ্ছিল। একমাত্র আমার বড় বোন আমাকে নিয়ে কিছুটা বিব্রত হয়েছিল। তবে আমি খুব সাবধান ছিলাম। ওদের যত খুশি হাসির সাথে কিছুতেই যেন আমাকে নিয়ে আরও মজা করতে না পারে সেজন্যে স্কার্ট দিয়ে মাটির ভেজা অংশটি লুকিয়ে রেখেছিলাম।

লজ্জা পেয়ে দুহাতে মুখ ঢেকে সেখানেই বসে থাকলেও আঙুলের ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে মেরে সবকিছু দেখছিলাম।

অবশ্য সেই রাতে আমি প্রথম বুঝতে পেরেছিলাম সাকিনা কেন তার চুড়ির আওয়াজ চেপে রাখত বা লুকিয়ে সেগুলোকে কেন গর্তে ফেলে দিত তার গোপন রহস্য। আসলে চুড়ি আর নূপুরের শব্দ শুনে ওর আব্বু জানতে পেরে যেত সাকিনা কোথায় আছে বা কোথায় গেছে। তবে সাকিনার চুড়িগুলোর শব্দ ছিল অন্য রকমের, স্পষ্ট এবং স্বতন্ত্র। যা কিনা সাকিনার আম্মুর পরা চুড়ির বাজনা থেকে ছিল একদম আলাদা।

সাকিনাদের বাসা থেকে দাদিমা যখন আমাদের নিতে আসেন তখন তাকে পুরো গল্পটি জানানো হয়েছিল। হাসতে হাসতে এমনিতে কড়া হৃদয়ের আমার দাদিমার চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ছিল। লজ্জায় আমি সাকিনার জামাকাপড়ের আলমিরার পেছনে লুকিয়ে ছিলাম। দাদিমা সেখান থেকে আমাকে বের করে আনে। আমার ভাগ্য অনেক ভাল যে সাকিনার গয়না না বলে পরেছিলাম বলে ও কিছু মনে করেনি। বরং ক্ষমা করে দিয়ে বলেছিল, ওকে বললেই ওগুলো ও আমার হাতে এবং পায়ে পরিয়ে দিত। সাকিনা ছিল আমার সবচেয়ে ভাল বন্ধু । এ ঘটনা আমাদের বন্ধুত্বকে আরও গাঢ় করে তুলেছিল।

তবে বাসায় এসে দাদিমা আমাকে খানিকটা বকাঝকা করেছিলেন। পরে কেনাকাটার জন্য মুদি দোকানে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে নিয়ে তিনি আমাকে বলেছিলেন, তুমি যা করেছ তার জন্যে তোমার শাস্তি হল মুদি দোকান থেকে কেনা সমস্ত সদাইপাতি তোমাকে বাড়িতে বয়ে আনতে হবে। কিন্তু যখন আমরা বাজারে গিয়েছিলাম, তখন দাদিমা সবজি দোকানের কাছে না গিয়ে সরাসরি সেই ছোট্ট লোকটির কাছে নিয়ে গেছিলেন যিনি চুড়ি এবং পায়ের নূপুর বিক্রি করত। চুড়ির শব্দ শুনে আমি ত আনন্দে মোহিত হয়ে গেছিলাম। লোভীর মত দুহাত ভরে চুড়ি পরার জন্য আমি বেছে নিয়েছিলাম উজ্জ্বল গোলাপি চুড়ি।

খুশিতে আনন্দে কৃজ্ঞতায় আমি দাদিমার হাতে চুমু খেয়েছিলাম।

দাদিমা নিজের কাজে খুব খুশি ছিলেন। আমার সব বোনের জন্য এক সেট করে চুড়ি বেছে নিয়ে আমরা যখন বাসায় ফিরে সেগুলো বোনদের উপহার দিচ্ছিলাম, তখন আমি এবং আমার বোনেরা খুশিতে আত্মহারা হয়ে গেছিলাম। আনন্দ খুশি হাসিতে আমরা আমাদের উত্তেজনা ধরে রাখতে পারছিলাম না। চুড়ি ঝাঁকিয়ে রিনঝিন রিনঝিন শব্দ করে বাসার প্রতিটি রুম ভরে ফেলেছিলাম। দাদিমার উপহার পাওয়া চুড়িগুলো আমাদের দেওয়ালের উপর দিয়ে সাকিনাদের পাশে ঝুলিয়ে দেখিয়ে ঝাঁকিয়ে সাকিনাকে ডাকাডাকি শুরু করে দিয়েছিলাম।

আমরা এতবেশি চুড়ির শব্দ করছিলাম যে সাকিনা নিজের চুড়ির আওয়াজ চেপে আমাদের সাথে বেরিয়ে এসেছিল। ওর আব্বুর তীক্ষ্ণ সতর্ক কান ওকে সনাক্ত করতে পারে নি। আমাদের উঠান জুড়ে চুড়ির শব্দতরঙ্গ ব্যাপক বাজনার ঝড় বইয়ে দিচ্ছিল তাতে সাকিনার আব্বু উপলব্ধি করতে পারে যে, সাকিনা ঘরের কাজকর্মের পরিবর্তে আমাদের সাথে খেলছে।

আমি এবং আমার বোনেরা জানতাম যে আব্বু আম্মু ফিরে না আসা পর্যন্ত আমাদের এই আনন্দ উৎসব শেষ হবে না । কিন্তু হঠাৎ বাঁধ ভাঙ্গা বন্য আনন্দ উৎসবের মধ্যেই আব্বুআম্মু উপস্থিত হয়ে অবাক করে দিয়েছিল। আমাদের অবস্থা দেখে আব্বু ত প্রথমে রেগে আগুন হয়ে গেছিলেন। রেগেমেগে তিনি তার গানবাজনা মগ্ন আলুথালু পাগল পাঁচটি মেয়েকে চড় মারতে হাত তুলেছিলেন এবং চুড়ি ভেঙ্গে দিতে চেয়েছিলেন। আমরা একেবারে হাতেনাতে ধরা পড়ে আব্বুর রাগের সামনে ভয় আতঙ্কে কাঁপছিলাম। কিন্তু দাদিমা দ্রুত তার বেতের লাঠি দিয়ে আব্বুর হাতটাকে আটকে দেয় বলে বেঁচে গিয়েছিলাম। এরপর পরিবেশ শান্ত হলে সাকিনাদের বাসায় কি ঘটেছিল সে সম্পর্কে আস্তে আস্তে দাদিমা তাদের জানায়। শুধু সাকিনার আব্বুর ভয়ে আমি যে পেশাব করে নিজেকে ভিজিয়ে ফেলেছিলাম সেই লজ্জার কথা তিনি চেপে যান। সব শুনে আব্বুর রাগ বাতাসের মত উড়ে যায় আর আব্বু আম্মু দুজনেই হেসে ফেলেন।

অবশেষে আব্বু আমাদের চুড়ি পরার সখ মেনে নিয়েছিলেন। এমনকি চুড়ির রিণিকঝিনিক শব্দ নিয়ে তিনি কখনও আপত্তি করেন নাই। তবে আমরা সবাই জানতাম দাদিমা আমাদের সোনার চুড়ি কিনে দেন নাই, দিয়েছিলেন কাঁচের চুড়ি। এগুলো ভেঙ্গে গেলে তিনি কখনও আমাদের জন্যে আর চুড়ি কিনে দিবেন না।

এরপর অনেক বছর কেটে গেছে। সাকিনা আর আমি সেরা বন্ধু হয়ে গেছি। আমার বিয়ের আগের রাতে, হাতে মেহেদি লাগানোর সময় সাকিনা অন্যান্য মহিলাদের কাছে আমার চুড়ি পরার গল্পটি বলছিল। অবশ্য আমাকে ক্ষ্যাপানোর জন্যে সাকিনা একটু বেশি বেশি রঙচঙ মেখে বলছিল বলে আমি লজ্জায়

ঘোমটার ভেতর মুখ ঢেকে হাসলেও অন্যদের মত খুব মজা পাচ্ছিলাম। আমার স্বামিও গল্পটি শুনে লুফে নিয়েছিল। খুব সম্ভবত তার ছোট বোন তাকে গল্পটি জানিয়েছিল।

আমাদের হানিমুনের দ্বিতীয় রাতে স্বামি আমাকে দু সেট সোনার চুড়ি এবং দক্ষ হস্তশিল্পীর নিপুন হাতে করা একজোড়া নূপুর উপহার দিয়ে চমকে দিয়েছিল। আমি তার উপহার পেয়ে শিউরে উঠেছিলাম। যদিও সে বলেছিল, আমাকে খুশি করার জন্যেই সে এগুলো এনেছে। আমার দু হাতের কবজি থেকে কনুই পর্যন্ত সে চুড়ি দিয়ে ভরে দিতে চেয়েছিল।

কিন্তু আমি এখন বুঝতে পারি, সে আসলে এ উপহারগুলো এনেছিল সাকিনার আব্বুর মানসিকতার থেকে শিক্ষা নিয়ে তার মতের সাথে একমত হয়ে।

লেখক পরিচিতিঃ

এই গল্পটি আগে রায়হান ছদ্মনামে প্রকাশিত হয়েছিল এবং প্রথমবার আফগান কমিউনিকেটরের নভেম্বর-ডিসেম্বর 1998 সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। আফগান কমিউনিকেটর পুনরায় প্রকাশনার অনুমতি প্রদান করে।

জোহরা সাইয়েদ ব্রুকলিন ভিত্তিক আফগান আমেরিকান কবি। তার কবিতা এবং প্রবন্ধ অসংখ্য পত্রপত্রিকা এবং জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে।

পাঠপ্রতিক্রিয়া

গল্প, নীতিশিক্ষা ও ভাঁটফুলসূত্র

মোস্তফা জামান

ভাষার সঙ্গতে মানুষের সকল সঙ্গম সম্ভব হয়ে ওঠে। মানুষের সাথে মানুষের সঙ্গম, মানুষের সাথে প্রকৃতি ও আসীমের সঙ্গমের সকল আয়োজনও ভাষার মধ্যে দিয়া ঘটে। এই আয়োজনের সফল ও অসফল, কিংবা আদিম ও আধুনিক কাঠামো রয়েছে। গল্প, কবিতা, উপন্যাস- এসবই আধুনিক সমাজের পক্ষে নানামুখী তৎপরতার নমুনা বিশেষ। তবে, এই তিন পদের আয়োজনের মধ্যে গল্প ও কবিতার আদি রূপ যেকোন সমাজে এখনও টিকে আছে বললে সত্যের অপলাপ হয় না। গল্প কবিতার ফর্মে কাহিনী বয়ানের আদি সংস্কৃতি গ্রামে-গঞ্জে এখনও কিছুটা হলেও টিকে আছে। এদের প্রতি আধুনিক বিদ্যোৎসাহী সমাজের সম্ভ্রম কম। ফোক বা লোক ঐতিহ্য নামে এইসব ফর্মের শ্রেণী নির্ধারণ করা হয়। এদেরকে অধঃশ্রেণীর বলে একধরনের নির্দিষ্ট আহলাদের মাত্রায় বিচার-বিশ্লেষণও করেন অনেক গবেষক। কারণ আধুনিকতার আরেকটি অবিসংবাদিত প্রপঞ্চ হলো সকল সৃষ্টিশীল ও বুদ্ধিবৃত্তিক আচার-আচরণের তদন্ত করে তাকে জ্ঞানের আওতায় নিয়ে আসা। গবেষণা এই পদের বিশেষ রচনা।

এতো এতো নব্য ও সর্বব্যাপি আয়োজনের মধ্যে বিংশ শতকে আধুনিকদের হাতে যা ছিল অবহেলিত তা হল ইংরেজিতে যাকে বলে ‘প্রাইমর্ডিয়াল ফর্ম’, অর্থাৎ যে গঠন মানুষের মনোকাঠামো একদা গড়ে তুলেছে বলে ধারণা করা হয়। এই অভিধার সূত্রে দাবি করা চলে যে, সভ্যতার বিকশিত অবস্থায় যে সাংস্কৃতিক সংস্রবের সূচনা, যার ফল দাঁড়ায় আধুনিক কবিতা, গল্প ও উপন্যাস, তার পূর্ববর্তী সময়ের সভ্যতার মূলস্রোত যদি হয় এপিক বা মহাকাব্য, এরই অপর হিসাবে লোকালয়ে প্রচলিত গল্প চালু ছিল। মহাকাব্য ও প্রচল গল্প- এই দুইই আদি কাঠামো বলে দাবি করা যায়। কিন্তু এমন দাবির মাঝে সবচেয়ে প্রভাব বিস্তারকারী রচনা- যা ঐশি কিতাব নামে চিনি, তার জায়গা থাকে না। যদি মন ও মননের স্তরভেদে সাহিত্যের আরোচনা পুনরায় শুরু করা হয়, তবে ‘স্থায়ী ও ‘অস্থায়ী মনন, এই দুই পদের সূত্রে অধঃ ও নিম্নমার্গের এপিক ও প্রচলিত কিচ্ছা-কাহিনীর ভেদাভেদ ভুলে এদের ডিপ স্ট্রাকচার বা মৌল কাঠামোতে চোখ রাখা জরুরি। এই মৌল কাঠামো ব্যক্তি ও সমাজ মানস শাসন করে। তবে আধুনিক প্রপাগান্ডা বা বিজ্ঞাপন যেভাবে মনোজগত দখল করে তেমন কোন কাঠামো এখানে জারি থাকে না। হয়তো উনবিংশ শতকের ভাবুক গুস্তাফ ফ্রেটেগের পিরামিডের সূত্রে গল্পের আভ্যন্তরিন বিষয়ে কিছুটা জ্ঞান জন্ম লয়। তাঁর পিরামিড মডেলের প্রথম ধাপ শুরু হয় কোন ঘটনার বা অবস্থার প্রকাশ থেকে এবং তা পিরামিড শীর্ষে ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছায়, আর তারপর ধীরে নেমে যায় অবিসংবাদিত উপসংহারের দিকে। কিন্তু এটি গ্রীক ট্র্যাজিডি থেকে শুরু

করে শেক্সপিয়ারের নাটক- এমত ক্লাসিক কলেবরের ব্যাখ্যা মাত্র। গল্প ও গল্পের মধ্যে কি করে মানুষ তাৎপর্য পাঠ করে এমন বিমূর্ত যোগের ওপর এই পিরামিড কোন আলো ফেলে না।

তাহলে গল্প ও তা শোনার মধ্যেকার মূল মন্ত্রটা কোথায় বাস করে? গল্পের শরীরে নাকি শ্রোতার শ্রবণ ও তাৎপর্য খুঁজে পাওয়ার শক্তিতে? এই প্রশ্নের মধ্যেই রূপক গল্পের মাজেজা কিছুটা ঠাওরে আনা যাবে। [বোরহেস, যিনি আধুনিক যুগের লেখক হয়েও গল্পের আদি কাঠামো - অর্থাৎ রূপকগল্প বলা আয়ত্ব করেছিলেন - অক্সফোর্ডে এক বক্তৃতায় এ বিষয়ে একটি মূল সূত্রের অবতারণা করেন। বোরহেসের মতে স্বাদ বা সোয়াদ আপেলের মধ্যে নাই, এমনকি মানবের মুখেও তার হদিস পাওয়া যাবে না। সোয়াদ সুনির্দিষ্টভাবেই কামড়ে বিদ্যমান। এই হচ্ছে স্বত্বা ও স্বত্বা জাগানিয়া রস আস্বাদনের কাঠামো। দেহজ ও বৈদেহী যে অনুপ্রেরণা- অর্থাৎ গল্প থেকে যে ভাব-ভাবুকতা যাউৎপাদনের সূত্রে দেহ দেহের অধিক মর্মের দ্বারে পৌঁছায়- সবই কামড়ের সূত্রে ঘটে।

আমরা কথায় কথায় বলি, অমুকের অমুক লেখাটিতে কামড় বসাতে কষ্ট হলো। যা লেখক তথা ভাষ্যকার বলছেন, তা পাঠক বা শ্রোতা নিতে পারছেন না। রূপক কাহিনী পাঠ করা বা শোনার পর এ মন কথা বলতে শোনা যায় না। কারণ রূপক কাহিনীর কাঠামোতে একটি বিষয়ের অবতারণার মধ্যে দিয়ে অপর একটি বিষয়কে আলোকিত করার মৌলিক একটি ধারণা স্পষ্ট। অর্থাৎ রূপক তা-ই যার অর্থ গল্পের বর্ণনায় গর হাজির- যা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও সামাজিক প্রেক্ষিতে, এমন কি আজকের দিনে ব্যক্তিগত মনকাঠামোর ওপর নির্ভর করে অর্থ উৎপাদন করে। এখানে অর্থ তৈরীতে আধুনিক মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞানবা আধুনিক সাহিত্যতত্ত্ব হয়তো সাহায্য করতে পারে। আবার অর্থ উৎপাদনের সহজ রাস্তা ভুলে প্রবেশ করতে পারে অচেনা ময়দানে। আধুনিক বিদ্যার বৈভবের আলো অনেক ক্ষেত্রে তাৎপর্য হরণকারী বর্ণনা উৎপাদন করতে পারে। যেমন ইঙমার বার্গম্যানের খোদার অনুপস্থিতি কেন্দ্র করে যে ট্রিলজি তার একটি 'দি সাইল্যান্স'। এতে নাৎসী বাহিনীর বিশাল এক ট্যাঙ্ক একটা সরু গলিতে জোরপূর্বক প্রবেশ করার দৃশ্য রয়েছে। সাইকো এনালিসিসের সূত্রে কেউ কেউ এই দৃশ্যে নাৎসী ট্যাঙ্ক 'ফেলিক' প্রতীক হিসাবে অনুবাদ করেন। এক লেখক প্রশ্ন তুলেছেন ট্যাঙ্কটিকে সরাসরি আগ্রাসনের প্রতিনিধি হিসাবে দেখবার অন্তরায় কোথায়?

মোদ্দা কথা হলো, গল্প বলার ও গল্প শোনার স্বাভাবিক ও আদি একটি ফ্রেম আছে যাকে পুনরায় সামনে হাজির করতে পারলে অর্থ বা তাৎপর্য নির্মাণ বা মর্ম উদ্ধারের 'সহজ' প্রক্রিয়াটি সহজে বোঝা যাবে। আদি অভিধাটি হয়ত অনেকের কাছে, বিশেষ করে আধুনিকদের কাছে তেমন কোন তাৎপর্য বহন করে না, কারণ জ্ঞানের প্রশ্নে আত্মজ্ঞান বাদ দিয়ে জ্ঞানকে বস্তুমুখী ও উপযোগিতামুখী

করে তোলা প্রগতিবাদীতার মৌল প্রকল্প। আধুনিকতার আওতায় গড়ে ওঠা এমত বিজ্ঞানবাদীতার বিপরীতে সকল প্রকার সৃষ্টির একত্রের ধারণা হলো আদি ধারণা। গল্প শোনা ও তার আস্বাদ গ্রহণ ঘটনাটি যে কামড়ের মধ্যে চিহ্নিত করা গেলো, এটি স্বাদ লওয়ার আদি ফ্রেম। এমন কথার মধ্যে মানব সত্য, যা অবস্থাগত সত্য, ও বস্তু জগতের একত্রের ধারণার উপর সুপ্রতিষ্ঠিত।

এতোসব কথা ভাঁটফুলসূত্র নামের এক ই-সাময়িকীর সূত্রে বলা গেল। ভাঁটফুলসূত্রের ফাল্গুন ১৪১৭ বা ফ্রেরুয়ারি ২০২১ সংখ্যাটি সাজানো হয়েছে ‘প্যারাবল বা রূপক কাহিনীর থিম কেন্দ্র করে। প্যারাবল কেবল সোজাসাপ্টা রূপক কাহিনী নয়, এতে মরাল বা নৈতিক শিক্ষা একটি মৌল উপাদান। তবে, রূপক কাহিনী নিয়ে যে যে ভাবনার ওপর আলো ফেলা গেল, তার ভিত্তিতেই নীতিকাহিনীর সার ও শরীর বিষয়ে কথা বলা জায়েজ হবে ধারণা করা যায়।

নব্য শতকে ই-সাময়িকী ছাপাখানার জায়গা দখল করে নিয়েছে। ভাঁটফুলসূত্রের জন্ম যদিও বেশী দিনের ঘটনা নয় - নীতিকাহিনীর সংখ্যাটি তৃতীয় সংখ্যা।

শুরুতে ঘোষণা রয়েছে এই পত্রের কোন সুনির্দিষ্ট বা চেনাজানা গন্তব্য নাই। ইংরেজিতে যাকে বলে ‘ডিরেকশনাল, কোন গমন নেই । কয়েকটি সুনির্দিষ্ট বাক্যের শুরুতেই বলা হয়েছে- ‘ভাঁটফুলসূত্রের কোনো ধ্রুবতারা নেই। অর্থাৎ কোন ‘মাস্টার’ এমনকি ‘মাস্টার ডিসিপ্লিন’বা ‘মতবাদ’ অগ্রাহ্য করে কয়েকজন লেখক একত্রে এই মার্গহীন কথা-গল্প-কবিতার স্বর্গ গড়ে তুলেছেন। প্রাককথন আছে কিন্তু কে কথা কইল তার হদিস নাই। নাম অনুল্লেখ থাকা অস্বস্তিকর-

হয়তো মার্গ হতে দূরে থাকবার বাসনার অংশ এটি।

ভাঁটফুলসূত্রের তৃতীয় কিস্তির প্রথম ভাগ প্যারাবল নামে উপস্থাপন করা হয়েছে, দ্বিতীয় ভাগে আছে প্রবন্ধ, যদিও ঠাঁই পেয়েছে একটিমাত্র লেখা। তৃতীয় পর্বে রয়েছে অনুবাদ প্যারাবল ও পরপর আরো তিনটি পর্বে কবিতা, গল্প ও শিল্পকর্ম উপস্থাপন করা হয়েছে।

ভাঁটফুলসূত্রের চতুর্থ সংখ্যায়ও তৃতীয় সংখ্যার ছায়া পড়েছে। বিষয় হিসাবে প্যারাবল বা রূপককাহিনী বিষয়ে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ ও প্যারাবল শিরোনামে একটি পর্ব এতে যুক্ত হয়েছে। প্রবন্ধটি দীর্ঘ এবং এতে নানান অনুষঙ্গে রূপককাহিনীর চরিত্র তুলে ধরেছেন লেখক মাজহার জীবন। 'প্যারাবল: বিন্দুর ভেতর সিন্ধু দর্শন'শিরোনামের প্রবন্ধটি অন্ধের হস্তি দর্শন বিষয়ক প্রচলিত প্যারাবল দিয়ে শুরু হয়ে এর নানান মাত্রা পরিভ্রমণের মধ্য দিয়ে এর ধর্মীয় ও আধুনিক ব্যবহার বিষয়ে পাঠককে সজাগ করে তোলে। অপরদিকে প্যারাবল পর্বে মনিরা রহমান ও রফিক জিবরানের প্যারাবল ছাপা হয়েছে। প্রথমজন গদ্য-চালে প্যারাবলের কাঠামো গড়েছেন, দ্বিতীয় লেখক কাব্যিক হবার প্রয়াস পেয়েছেন, অর্থাৎ গদ্যের মধ্যেই তিনি কবিত্ব ফুটিয়ে তুলেছেন। ভাষার সৌন্দর্য্য বা নান্দনিকতা থেকে দূরে থেকে জীবনের নৈতিক প্রশ্নের মুখোমুখি হবার তাগিদে ভাষায় যে মেদহীনতা গড়ে ওঠে প্রচলিত প্যারাবলের জনপ্রিয়তা নিশ্চিত করে, এমন কোন প্রক্রিয়ার সূত্রে এই প্যারাবলগুলো লেখা হয় নাই। যাহোক, ভাঁটফুলসূত্রের তৃতীয়সংখ্যা যেহেতু প্যারাবলকে বিষয় হিসাবে গণ্য করে গড়ে তোলা হয়েছে, সেই আর্কিটেকচারে প্রথমে ঢু দেয়া যাক।

ভূমিকায় 'প্যারাবল সাহিত্যের এক প্রাচীন পরম্পরা', এবং এই 'পরম্পরায় যুক্ত হয়ে পাঠকের সনে সখ্য গড়ে তুলতে চায় এর লেখকরা', এমন ঘোষণা থাকলেও রফিক জিবরানের লেখা পাঠকের কাছে সহজে জানালা-দরোজা খুলে ধরে না। প্রথম দুটি ছোট লেখা- 'মধুপুর' ও 'নআমা হিচুইয়ের শিল্পদর্শন'- যদি কাব্যিক বিচারে লঘু চালের হয়, তবে 'দুটি প্রশ্ন' 'রামনি পঙ্খি' ও 'গন্তব্য'সভ্যতা, সত্তা এবং জীব ও জীবনের সংকট ও সম্ভাবনা নিয়ে ভাবুকতা বিষয়ক।

রফিক জিবরানের 'দুটি প্রশ্নে'যে 'চিন্তাপার্থক্য'তিনি সেমেটিক ও মিশরীয়দের মাঝে লক্ষ্য করেছেন তা ভাষাগত কাব্যিকতার কারণে যথেষ্ট অস্পষ্ট। তবু, লেখকের পক্ষপাত যে মিশরীয়দের অনন্ত 'আনন্দে বিহার' করবার ক্ষমতার প্রতি তা অনুমান করা যায়। তাঁর নআমা হিচুইয়ের কাহিনীতে 'বাস্তব-পরাবাস্তব দেয়াল- দালি, পিকাসো, মাতিসের রঙ ও রেখার বাঁধন পেরিয়ে জালালউদ্দীন রুমির গোলাপ বাগানে', 'অলৌকিক আনন্দ' পাওয়ার খবর, মিশরীয়দের ক্ষমতা-কেন্দ্রীক শাসন ও সভ্যতার বিকাশের সাথে সাযুজ্যপূর্ণ নয় বলে ঠাওর হয়। যদি

সভ্যতাতত্ত্ব দিয়ে দেখা যায় তবে পাশ্চাত্যের ধন ও আনন্দ ও প্রাচ্যের ধন-চুরি যাওয়ার কাহিনী এখানে প্রনিধানযোগ্য। কারণ ভারত, আফ্রিকা ও আমেরিকার ভূমিদখল ও সম্পদ চুরি না করে পাশ্চাত্যের অগাধ আনন্দের বাগান যেমন তৈরি করা সম্ভব হয় নাই, তেমন মিশরীয় ক্ষমতাকাঠামোর মাথায় বসে যারা মৃত্যুর পরও ঈশ্বর হয়ে থাকবার বাসনায় পিরামিড গড়েছেন দাসশ্রমের ভিত্তিতে, তাদের অফুরান আনন্দও মানবের মানবিক আচরণের ফল নয়। অন্যদিকে রুমির আত্মতত্তের সূত্রেও গোলাপে কাটা বিদ্যমান। আলো দেহের ক্ষতের মধ্যে দিয়ে সত্তাকে সজাগ করে- এমন বাক্য বিংশ শতকের কবি এমনকি গানের মহাজন লেনার্ড কোহেনকেও ভাবিয়েছে। The wound is where the light gets in' তাই আজো ভাবুকের খোরাক।

ভাঁটফুলসূত্রের প্রবন্ধ পর্বে বদরুজ্জামান আলমগীরও একই সূত্রে ভিন্ন চিত্রকল্প হাজির করেন। 'পুড়ে ছিদ্র হয়েছে বলে বাঁশির সুরে আমাদের মনে এমন জোয়ার ভাটা ও চন্দ্রকলা লাগে।'এমন আপ্তবচন রফিক জিবরানের বাগানেও ফলেছে- তবে তা অনেক ক্ষেত্রে পাঠককে খুঁজে বের করে নিতে হবে। যেমন - 'কোথায়ও যাওয়া হয় না, কেবল স্থানান্তর ছাড়া' কিংবা 'অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যবিন্দুতে অদৃশ্য এক বর্তমান ক্রমাগত দূরে সরে যায়' - এসবই দার্শনিকতার দিকে নির্দেশ করে। 'গন্তব্য' নামের এই অনু-আলেখ্যে যদি এমত দার্শনিকতার আঁচ স্পষ্টতর, তা এ কথাই জানান দেয় যে লেখক চিন্তক বটে, তার ভাষার দরদালানের কাঠামোতে অহেতু কিছু গুঞ্জন হয়তো দূরে ঠেলে দিতে পারলে, মর্মই কাঠামো হয়ে ধরা দিবে। এমন মেদহীনতা তাঁর 'দুটি প্রশ্ন'-এর কাঠামোতে লক্ষ করা যায়। এর সমাপ্তি পর্বে শেষ না হয়ে যাবার যে ভাব ফুটে ওঠে তা প্যারাবলের শক্তি। লেখক লিখছেন: 'স্বর্গের গেটে হ্যাঁ ও না-এর মাঝখানে কোন উত্তর হবে না! হয় হ্যাঁ নয়তো না। আমি কী বলবো?'

বদরুজ্জামান আলমগীর যে প্রবন্ধের খাঁচা নির্মাণ করেছেন তা ব্যতিক্রম এক কাঠামো। 'আয়নার ভিতর ময়না যে আছে' লেখাটিকে তিনি এমন গড়েছেন যেন মন্তব্য বা বক্তব্যপথে গমন না করে, তা নিজেই এক গল্পের আধার হয়ে ওঠে।

কাজাখস্থানের একটি লোকগাথা দিয়ে পাঠক এই লেখায় প্রবেশ করার সুযোগ পায়। নাপিত চুল কাটতে গিয়ে রাজার মাথায় যে শিং দেখে ফেলেন তা গোপন রাখতে রাখতে তার পেট ফুলে ওঠে। অবশেষে এই মুসিবতের বা মুশকিলের আসান হয় এক জঙ্গলেরভিতর ইঁদারা বা কুয়ায় যে মনুষ্য অবয়ব দেখতে পায় তাকে রাজার মাথায় গরুর শিং এই সত্য বলে দিয়ে নাপিত তার স্বাভাবিক পেট ফিরে পায়।

এই গল্প প্রমাণ যে, যা আধুনিক মননে শিক্ষামূলক বলে দাবী করা যায়, তেমন

বিশ্লেষণী প্রতিভা বা বর্ণনার মধ্যে দিয়ে এই প্যারাবল মানুষের মেধা বাড়াবার ভার নেয় না। বরং সত্য বলার মধ্যে দিয়ে এটি শিক্ষার এক চিরন্তন দিক তুলে ধরে। দেহ ও মনের যে সম্পর্ক, মনের অবস্থা যে দেহে উপসর্গের জন্ম দেয়- এসব বিষয়ে আধুনিক সাহিত্য কোন সত্য বলতে চায় না, কেবল বিশ্লেষণ উপস্থাপন করতে চায়। মনোদৈহিক দশার কোন সুরাহা বিষয়ে আধুনিকেরা উৎসাহী হয় নাই। আধুনিকতা এই অর্থে তৃষিতের কষ্ট নিয়ে কথা বলে, তৃষ্ণা বিষয়ে মারিফা, বা উচ্চমার্গীয় জ্ঞান উৎপন্ন করে, কিন্তু কোন ফায়সালার দুয়ারে কড়াঘাত করার চেষ্টা করে না। কৃতবিদ্য বাঙালি আধুনিক কুট রচনাভঙ্গি গ্রহণ করেছেন, কিন্তু বদরুজ্জামানের ভাষা ধার করে বলা যায়, চক্ষুষ্মানের দেখা যে অর্ধেক আধুনিক সাহিত্যে তার হদিস বিরল। দৃশ্যমানতা যে দৃশ্যহীনতা - এই দুয়ের মধ্যস্থতায় যে জগতের সত্য পূর্ণরূপে ধরা দেয়, এই কথা লেখক তাঁর একজন অন্ধ বুদ্ধের সাথে আরেকজন অন্ধ বুদ্ধের দেখা হওয়ার পর যে দেখার সম্ভাবনা তৈরি হওয়ার কাহিনীর মধ্যে দিয়ে বলেন। লেখক কাহলিল জিবরানের অন্ধ জ্যোতির্বিদের উদাহরণও টানেন - যিনি বুকে হাত রেখে দুষ্পাঠ্য জগৎ পাঠ করতে পারেন। [তবে, নীতিশিক্ষায় বা নৈয়ায়িক শক্তির বিকাশে ধর্মীয় রূপক কাহিনীর বিকল্প নাই। আশরাফের ক্ষমতা ও সংস্কৃতির বিপরীতে যেমন আতরাফের পক্ষে স্রষ্টার সমতা-নির্ভর সংস্কৃতি গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে অবতার বা নবীরা শ্রেণিকেন্দ্রীক ক্ষমতা কাঠামো থেকে বেরিয়ে আসার প্রয়াস পান। যদিও ভাঁটফুলসূত্রের ৩য় সংখ্যায় ঈসা নবীর মসীহ খেতাব মশীহ ও মসীহ এই দুই রকমফের দেখা যায়। রুবাইয়াত রিক্তার অনুবাদে ফ্রানৎস কাফকার 'মশীহ'র আগমন' নামের প্যারাবলে এমন ব্যত্যয় লক্ষণীয়। তবে, ভাবের ব্যত্যয় এতে ঘটে নাই। বরং আধুনিক ইউরোপীয় প্যারাবলে ভাবের ব্যত্যয় লক্ষণীয়। যেমন 'মশীহ'র আগমন' এ হেঁয়ালীর মাত্রাটি ধর্মীয় প্যারাবলে বিরল। 'মশীহ যখন আসবেন... তিনি আসবেন, শেষ দিনে নয়, কিন্তু একদম শেষে... ।' এমন হেঁয়ালির পিছনে গূঢ় অর্থ খুঁজে পাওয়া মুশকিল। তবে, এমন নয় যে, অর্থের দূয়ারে যাওয়ার সোপান তৈরী করে দেওয়াই গল্পকারের কাজ। বরং অনেক ধর্মীয় গল্পে ধাঁধাঁর উত্তর খুঁজে নিতে গিয়ে এখনও দার্শনিক প্রজ্ঞার জন্ম দিয়ে চলেছে। বাইবেলে উল্লেখিত গুড সামারিটানের কাহিনী তুলনামূলক সোজাসাপ্টা অর্থ তৈরী করে কোন ধন্দ কিংবা হেঁয়ালির আড়াল ছাড়াই। এতে যিশুর মর্মবাণী খুব সহজে ধরা দেয়। উচ্চমার্গের ধর্মচারী হওয়ার কারণে যখন দুজন ব্যক্তি সহজেই এক আক্রান্ত, আহত আগুন্তককে সেবা না দিয়ে হেঁটে চলে যান, তখন সামারিটান গোষ্ঠীর এক ব্যাক্তি এই অচেনা বিপদগ্রস্ত লোকটিকে সেবাশ্রুশ্রষা দিয়ে সুস্থ করে তোলেন। গল্পটি অপরকে আপন করে ভাববার অনুপ্রেরণাদায়ী কাহিনী হিসেবে যেমন পাঠ করা যায়, তেমন সমাজে যার স্থান নাই এমন মানুষের মধ্যে যে মহৎ কর্ম করার সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে, তার দিকেও নির্দেশ করে। এমন অনেক গল্পই মানুষের চোখ খুলবার উপলক্ষ্য তৈরী করে। আদম-হবার জ্ঞান-বৃক্ষের ফল খাওয়ার ঘটনা ও ভাষা বা জ্ঞান অর্জন পরবর্তী জীবনের শুরু কিংবা কোরানে উল্লেখিত নবী ইব্রাহিম ও তাঁর পুত্র ইসমাইলের উৎসর্গের কাহিনী- যা বাইবেল থেকে যথেষ্ট ভিন্নমাত্রার - এমন সকল রূপক ও নৈয়ায়িক

কাহিনী নানান ব্যাখ্যার সূত্রে এখনও সাম্প্রতিক সমাজ ও সমাজমানস বিষয়ক আলোচনায় কাঠখড় যোগান দিয়ে যাচ্ছে। দার্শনিকদের মধ্যে হাজি ক্যানান তাঁর 'দি এথিকস অব ভিজুয়ালিটি'নামের বইতে ইহুদী ও খৃষ্টীয় গল্পের দ্বারস্থ হয়েছেন, অন্যদিকে রেনে জিরার্ড তাঁর সারা জীবনের গবেষণায় ধর্মীয় মিথের জ্ঞানের আলোয় মানব সভ্যতা ও সমাজে সংখ্যাগরিষ্ঠের সন্ত্রাস ও স্কেপগোটের ধারণা বিষয়ে সারাজীবন বই লিখে গেছেন।

ভাষান্তরিত রূপক কাহিনীসূত্রে ভাঁটফুলসূত্রের এই সংখ্যা সাধু হয়েছে। ভিড়ের মধ্যে পরিচিত মুখ যেন এইসব রচনা।

৩য় সংখ্যার দূর্বলতম পর্ব হলো এর কবিতাংশ। এতে থৈ পাওয়ার মতো মৌলিক বা খাটি বস্তু নাই। স্থায়ী মননের খোঁজ তো আরো পরের হিসাব। স্থায়ী মনন মানুষ ও জীবন বিষয়ে কিছু প্রয়োজনীয় প্রশ্নের অবতারণা করে মনের মধ্যে এসবের সমাধান খুঁজে বের করার তাড়না জারি রাখে। কবিতাপর্বের আধুনিক কবিতা গুলান এর বিপরীতে দ্বিবিধ তলে বিরাজ করে - ভাষার বল্কল ও চাক্ষুষ বাস্তবতা। ব্যতিক্রম হলো রুমির তিনটি অনুবাদ কবিতা যাতে কাল্পনিক প্রেমিক মজনু ও তার মিউজ লাইলিকে উপলক্ষ্য করে মানুষকে কিছু সত্যের সামনে দাঁড়া করিয়ে দিয়েছেন এই সাধক-কবি।

গল্পের চাকে যা ভনভন করছে ভাঁটফুলসূত্রের ৩য় সংখ্যায়, সেখানেও অনুবাদ গল্পই অধিক সম্ভ্রম জাগায়। 'প্রণয়', যার প্রণেতা সাদাত সায়েম, তাঁর অস্তিত্ববাদী অধিবিদ্যা তিনি সুফি কান্তিবিদ্যা বা সৌন্দর্যতত্ত্বের মধ্যে দিয়ে হাজির করেছেন। গল্পটি সাদাত সায়েম ইংরেজিতে লিখেছিলেন। তর্জমার দায়িত্ব সার্থকতার সাথে পালন করেছেন ইশতিয়াক ফয়সল। 'লাভ নামের এই গল্পটি লেখকের প্রকাশিতব্য 'ডিসগ্রেস এন্ড আদারস্' গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত। যে সুফি কান্তিবিদ্যার কথা পাড়া হলো তা প্রেমের অপ্রতিরোধ্য শক্তির পাশাপাশি এর লাস্য, মাধুর্য ও কান্তি যে দেহ-মন-দুনিয়ার চরিত্রে প্রভাব ফেলতে সক্ষম এমন প্রত্যয়ে হাজির আছে। প্রেমসঞ্জীবনী নামে এক কাল্পনিক বস্তু ও তার বিক্রেতার বিশেষ এক ব্যক্তিত্ব নির্মাণের মধ্যে দিয়ে প্রণয় গল্পে ভালোবাসার সুবাতাস বইছে - হয়তো এর কিছুটা আমাদের সকলের প্রয়োজন আজ। মহামারির মধ্যে বেঁচে থাকার নতুন শব্দবীজ দরকার নেই, কায়ার মধ্যে কবি জীবনানন্দ যাকে 'বৈদেহী পবিত্রতা'তার জন্ম কয়েকটি ভাবউদ্দীপক আবেগই যথেষ্ট প্রণোদনা - প্রেম, যা লেখকের এই রহস্যময় চরিত্রের ভাষায় 'হৃদয়কে পুড়িয়ে পুড়িয়ে সোনায় পরিণত করে'।এই সূত্রেই লেখকের জীব ও জীবন বিষয়ক তত্ত্বে ভালোবাসার রহমত তার দুনিয়াদারীতে বাগানবিদ্যার অনুপ্রবেশ ঘটে। সঞ্জীবনী বিক্রেতার মুখে গল্পের প্রোটাগনিস্ট এই তত্ত্বে প্রথম কান দেন - প্রাণীজগতের আনন্দবেদনাও অনুভব করতে পারবেন। শুনতে পাবেন উদ্ভিদের হাসি-কান্না। গল্পের শেষে যে আপ্তবাক্যের পুনরাবৃত্তি লক্ষণীয় তা এমন: 'প্রেম কোন যুদ্ধ নয়, স্যার। মানে যুদ্ধ

আর প্রেমকে আপনি একই বাক্সে রাখতে পারেন না। এমনকি যুদ্ধেও আপনি যা খুশি তা করতে পারেন না।' আমিন।

প্যারাবল জীবনের এক প্রকারের নেকটার বা অমৃত আস্বাদনের স্বাদ দেয়। ফলে নৈতিক শিক্ষার বাহন হওয়া সত্ত্বেও এর আবেদন আধুনিক সাহিত্যের তুলনায় অনেক বেশি উচ্চতর। ধর্মতত্ত্ব থেকে শুরু করে গণরুচির পর্যায় পর্যন্ত এর ক্ষুদ্র অথচ শক্তিশালী কাঠামের ভিতটি বিস্তৃত। এর সম্মোহনী শক্তিটির ব্যাখ্যায় বোর্হেসের আপেলে ও কামড় বিষয়ক তত্ত্বই সবচেয়ে লাগসই। সমাজের মধ্যে যে ক্ষুধা তা মিটাবার জন্য ক্ষমতাধর যে নবী, কথক বা ভাষ্যকার, কিংবা গল্পকার যে ফল জোগান দেন তাতে কামড় বসাতে তেমন কসরত দরকার পড়ে না, লাগে 'প্রণয়'- যে প্রেম আসিক-মাসুকেরে একবৃত্তে ধরে রাখে, এমন জনগোষ্ঠীর মানস বা অচেতনকে ব্যাক্তির চেতনের মধ্যে অথবা ব্যাক্তির চেতনকে গোষ্ঠীর নিঃশ্চেতনায় পর্যবেশিত করে। এমন জাগতিক স্থানান্তরণ হয়তো বিমূর্ত বা মহাজাগতিক কোন সূত্রই হয়। ভাঁটফুলসূত্রের চতুর্থ সংখ্যায় মাজহার জীবন যখন লেখেন 'প্যারাবল সুনির্দিষ্ট মূর্ত ঘটনা বর্ণনা করে যার মাধ্যমে বিমূর্ত যুক্তি পাঠক সহজে বুঝতে পারে।' মহাজাগতিক অভিধার ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে যা নির্দেশ করবার চেষ্টা করা গেল, তা শুধু বিমূর্ত যুক্তি নয়। বরং যুক্তির ধর্মের চাইতে এতে বোধের ক্রিয়া বেশি প্রযোজ্য। আরেকটু আলো ফেলতে আমরা বাইবেলে বর্ণিত নবী ইসায়ার প্রতি খোদার নির্দেশ থেকে কিছুটা সজাগ হয়ে উঠতে পারি। হয়তো দুনিয়ায় চোখ রেখে, কান পেতে এর গতিপ্রকৃতি যে বুঝতে পারা যায় না, এ বিষয়ে আমরা আরো সচেতন হয়ে উঠব। ইসায়ার কাছে নির্দেশটি এমন - যাও, তোমার জনতাকে বল যে তারা শুনবে কিন্তু বুঝতে পারবে না, দেখবে কিন্তু অনুধাবন করতে পারবে না। অর্থাৎ সত্য অনুধাবনে কেবল শোনা আর দেখাই যথেষ্ট নয়, নিরাবরক কোন এক কাঠামো আছে যার মধ্যে দিয়ে সত্য অবয়ব পায়। প্যারাবল এমনই এক অবয়ব।

প্ল্যাটোর বহুল আলোচিত গুহা-তত্ত্বে এই প্রেক্ষিতে স্মরণে আনা যায় - মানুষ বাস্তবতা বলে যা খেয়াল করে, তা আসলে একটা গুহার অভ্যন্তর থেকে দেখা গুহামুখের আলোর বিপরীতে ছায়া মাত্র। আলোর উৎস সন্ধানীরই রূপককাহিনীর ভাষা, অভিব্যক্তি ও সহজিয়া কাঠামো- অর্থাৎ নিরাবেগ স্থাপত্যের- জন্ম দিয়েছেন। আধুনিক সাহিত্যে বোর্হেস এমত নবুয়তীর শ্রেষ্ঠ সূত্রধর।

পরিশেষে বর্তমান বিপর্যয়ের প্রেক্ষিতে অনলাইন তৎপরতার পক্ষে দুটি কথা বলা জায়েজ বলে মনে হয়। ছাপাইকৃত বই ও সাময়িকীর পক্ষে থাকার বহুবিধ কারণ চিহ্নিত করা যায়, বলা যায় যে সয়ংক্রিয়তা মানব কায়ার পক্ষে তেমন জুতসই নয়। কিন্তু বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষিতে, বিশেষ করে মহামারীর এই চুড়ান্ত অবস্থায় অনলাইন তৎপরতার বিকল্প নাই। ভাঁটফুলসূত্রের আগামী সংখ্যার অপেক্ষা করে এই লেখার সমাপ্তি টানা যাক।

ভাঁটফুল থেকে প্রকাশিত ই-বই:

শাহবাগ মন উদ্বাগ : ইচক দুয়েন্দে

দূরত্বের সুফিয়ানা : বদরুজ্জামান আলমগীর

এগারো সিন্দুর : রফিক জিবরান

তিন ডানাওয়ালা পাখি : রফিক জিবরান

পিপাসার জিনকোড : সাদাত সায়েম

মাটির উনুন ও যুবকের ওম : সৈয়দা হাবিবা

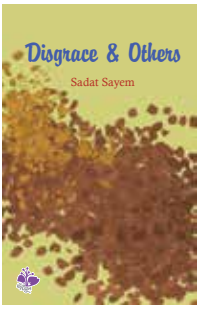

বইগুলো পেতে ভিজিট করুন:

www.bhatphul.com